স্বাস্থ্যের বৃত্তে

স্বাস্থ্য ও বিজ্ঞান বিষয়ক সাময়িকী

৩য় বর্ষ ❑ ষষ্ঠ সংখ্যা ❑ আগস্ট - সেপ্টেম্বর ২০১৪

সম্পাদক

ডা. পুণ্যব্রত গুণ

কার্যনির্বাহী সম্পাদক

ডা. জয়ন্ত দাস

সহযোগী সম্পাদক

ডা. পার্থপ্রতিম পাল ❑ ডা. সুমিত দাশ

সম্পাদকীয় উপদেষ্টা

ডা. অভিজিৎ পাল ❑ ডা. অমিতাভ চক্রবর্তী
ডা. অনুপ সাধু ❑ ডা. আশীষ কুমার কুন্ডু
ডা. চঞ্চলা সমাজদার ❑ ডা. দেবাশিস চক্রবর্তী
ডা. শর্মিষ্ঠা দাস ❑ ডা. শর্মিষ্ঠা রায়
ডা. তাপস মণ্ডল ❑ ডা. সোহম সরকার

বিন্যাস ও অঙ্গসজ্জা ❑ নিত্য দাস, মনোজ দে, তরুণ বসু

প্রচ্ছদ ❑ উৎপল বসু

বিনিময় ২০ টাকা

প্রকাশক

ডা. জয়ন্ত কুমার দাস

স্বাস্থ্যের বৃত্ত-এর তরফে

ফ্ল্যাট : এফ-৩, ৫০/এ কলেজ রোড

হাওড়া ৭১১১০৩

মুদ্রক

এস এস প্রিন্ট, ৮ নরসিংহ লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

সূ চি প ত্র

সম্পাদকীয় — সারোগেসি বা গর্ভদান ৩

প্রচ্ছদ নিবন্ধ : **হার্ট ব্লক ও পেসমেকার** ৫
হৃদযন্ত্রের অসুখে পেসমেকার কী কাজে লাগে? কখন লাগে? পেসমেকার বসাতে এত বেশি খরচ হওয়া কতটা যুক্তিযুক্ত, আর কতটা স্রেফ মুনাফা?
লিখছেন **ডা. গৌতম মিস্ত্রি**

প্রচ্ছদ নিবন্ধ : **জিন থেরাপি থেকে ডিজাইনার বেবি** ১৬
জিন কী? কেমন করে তা আমাদের দেহকে নিয়ন্ত্রণ করে, আর কেমন করেই বা জিনঘটিত অসুখের চিকিৎসা সম্ভব? জিন বদলে রূপে গুণে 'উত্তম' মানুষ তৈরির প্রকল্প ভাল না মন্দ?
লিখছেন **ডা. সুমিত্রন বসু**

প্রচ্ছদ নিবন্ধ : **সারোগেসি বা গর্ভদান— নৈতিকতা ও আইন** ৩১
গর্ভদানকারী 'মা' অন্যের হয়ে শারীরিক-মানসিক ঝুঁকি নেন। যখন সারোগেসি ক্রমে বৃহৎ বাণিজ্য হয়ে উঠছে, তখন গর্ভ ভাড়া দেওয়া 'মা'র আইনি সুরক্ষা কতটা, নৈতিক দায়ই বা কার?
প্রশ্ন তুলছেন **ডা. কাঞ্চন মুখার্জি**

প্রচ্ছদ নিবন্ধ : **ছানি অপারেশন** ১১
ছানি কাটার পরে আজকাল কৃত্রিম লেন্স বসানো দস্তুর, কিন্তু তাদের দামের ফারাক বিস্তর। কোন্ লেন্স আপনার দরকার, আর তার জন্য খরচ কী রকম, বুঝিয়ে বলছেন **ডা. সোহম সরকার**

রিউম্যাটয়েড আর্থ্রাইটিসের ব্যবসা-বাণিজ্য ১৩
এই অসুখে সময়ে চিকিৎসা না করলে পঙ্গু হয়ে যেতে হয়। তুলনায় সস্তা দামের ওষুধেই অধিকাংশ রোগীর কাজ হয়, কিন্তু যাদের হয় না, তাদের দরকারি ওষুধ বড্ড দামি। কেন?
প্রশ্ন তুললেন ডা. আশীষ কুমার কুন্ডু

নবজাতকের খাদ্য খাবার (পর্ব-৬) — স্তনদানের কিছু সমস্যা ২৩
মায়ের দুধ কম হলে কী করবেন? স্তনে ব্যথা হলে, স্তনবৃন্তে ঘা হলে?
উত্তর দিচ্ছেন **ডা. স্বপন বিশ্বাস**

অন্নপ্রাশন ২৭
ছ'মাস বয়সে বাচ্চা প্রথম অর্ধশক্ত খাবার খেতে শেখে, আস্তে আস্তে এক বছর বয়সের মধ্যে বড়দের মতোই খাবার খায়। এটা ঠিকমতো না হলে অপুষ্টি অনিবার্য—লিখছেন **ডা. মানস মহাপাত্র**

স্লিমিং সেন্টার — ও ওবেসিটি ৪১
মোটা হওয়ার সমস্যার চটজলদি সমাধান স্লিমিং সেন্টারগুলো কাকে রোগা করে? আপনাকে না আপনার টাকার থলিকে?
লিখছেন **ডা. অবন্তিকা পাল**

নারী নির্যাতন ও জনস্বাস্থ্য সমস্যা ৩৬
অত্যাচার শুরু হয় মেয়ে-জন্মের আগে থেকেই, চলে মরা পর্যন্ত! আমাদের সমাজে মেয়েদের মানসিক-শারীরিক ক্ষতি স্বাভাবিক, আর জনস্বাস্থ্যে তার প্রভাব ছেলে-মেয়ে সবার ওপর পড়ে।
লিখছেন **ডা. শর্মিলা মল্লিক**

যে পরীর ডানা নেই ৩৯
মেয়ে যাবে ইস্কুলে, কিন্তু বিয়ের পিঁড়িতে বসবে ক্লাস সিক্স-সেভেনে। এমনটাই রীতি যে! আমাদের গ্রামের স্কুলের ছবি, আর তা বদলে যাওয়ার স্বপ্ন আঁকলেন **রাণা আলম**

বার্ধক্যের চিকিৎসা শাস্ত্র-র তাৎপর্য ৪৫
আমাদের দেশে বয়স্ক মানুষের সংখ্যা অনেক। তাঁদের শারীরিক, মানসিক সামাজিক সমস্যা নিয়ে ভাবনার রূপরেখা দিচ্ছেন **ডা. অভিজিৎ পাল**

সর্প দংশন ৪৭
সাপের কামড়ে মৃত্যু আমাদের দেশে সবচেয়ে বেশি। এদেশে বিষাক্ত সাপ কামড়ালে মানুষ মরবেনই, অথচ অন্য দেশে বিষধর সাপের কামড় খেয়ে বেঁচে যান প্রায় সবাই। উপায় কী?
লিখছেন **ডা. শেখ মাসুম**

ত্বকে পদ্মকাঁটা ৫০
ত্বকে উঁচু কাঁটা কাঁটা, লোকের মুখে সে অসুখের নাম দাঁড়িয়েছে পদ্মকাঁটা। আসলে কিন্তু এটা একটা মাত্র রোগ নয়, অনেক রোগেই এই লক্ষণ দেখা যায়।
আলোচনা করছেন **ডা. শর্মিষ্ঠা দাস**

অস্বাভাবিকতার সন্ধান ৫১
মানুষের সামান্য অস্বাভাবিক আচরণকে লক্ষ্য করে তার গায়ে অস্বাভাবিকতার সিলমোহর লাগিয়ে দেওয়াটা অনৈতিক ও অত্যন্ত গর্হিত কাজ। তাই একজন মানুষ মানসিক ভাবে অসুস্থ কিনা এবং তার কী অসুখ করেছে সেই রোগ নির্ধারণ করার আগে তার সামগ্রিক মানসিক অবস্থার পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা প্রয়োজন।
আলোচনা করেছেন **রুমঝুম ভট্টাচার্য**

কালের ভালবাসা ৫৫
শারীরিক প্রতিবন্ধকতা নিয়ে ভাগ্যের সঙ্গে দুরন্ত লড়াইয়ের আত্মকথা
লিখছেন **সায়মদেব মুখার্জি**

কুইজ : অভিষেক দাস ৫৬

গল্প : দুনিয়া কাঁপানো একদিন ৫৭
সন্দীপ রায়

বা ণি জ্যি ক ন য়, মা ন বি ক

স্বাস্থ্যের বৃত্তে

স্বাস্থ্য, রোগ, চিকিৎসা, বিজ্ঞান ও সমাজ নিয়ে

আপনার সহমর্মী দ্বিমাসিক বাংলা পত্রিকা

প্রাপ্তিস্থান : পাতিরাম, বুকমার্ক, পিপলস বুক সোসাইটি, বইচিত্র, মনীষা গ্রন্থালয়, নিউ হরাইজন বুক ট্রাস্ট, অমর কোলের স্টল (বিবাদি বাগ), এস কে বুকস (উল্টোডাঙ্গা), শ্রমিক-কৃষক মৈত্রী স্বাস্থ্য কেন্দ্র (চেঙ্গাইল), লেখনী, ২/৪৬ নাকতলা কলকাতা ৭০০ ০৪৭, কল্যাণদার স্টল (রাসবিহারী মোড়), মেডিকেল কলেজ এমার্জেন্সি গেটের বাইরের স্টল, দুর্বার মহিলা সমন্বয় কমিটি, ধানসিঁড়ি (রায়গঞ্জ), বইকল্প (ঢাকুরিয়া), পুষ্প নিউজ এজেন্সি (মালদহ, ফোন ৯৯৩২৯৬৭৯৯১), জাতিস্মর ভারতী (জলপাইগুড়ি ফোন ৯৯৩২৩৫৪৯৫৮), প্রয়াস মল্লভূম (লোকপুর, বাঁকুড়া, ৯৪৩৪২২৭৪৯৯), মাধব পেপার স্টল, বালুরঘাট বাসস্ট্যান্ড ৯৯৩২৪৫৫২৪৪), প্রদীপন গাঙ্গুলি (দার্জিলিঙ ৮৫৩৫৮৯৫৩৯২), সোমা দত্ত (হাওড়া ৮৯২৬২৮৬২৬৪) শিয়ালদহ ও হাওড়া মেন সেকশানের বিভিন্ন স্টেশনের বই-এর স্টলে।

পাঠক ও লেখক পত্রিকার লেখার বিষয়ে যোগাযোগ করুন ৯৮৩০৯২২১৯৪, ৯৩৩১০১২৫৩৭
পত্রিকা পাবার জন্যে যোগাযোগ করুন ৯৮৩০৮৮৬৪৪১
ইমেল : swasthyerbritte@gmail.com

স্বাস্থ্যের বৃত্তে-র গ্রাহক হোন।
সডাক গ্রাহক চাঁদা ৬ টি সংখ্যার জন্য ১৮০ টাকা।
Sweasthyer Britto-র নামে চেক বা ড্রাফট পাঠান এই ঠিকানায়
এইচ এ ৪৪, সল্টলেক, সেক্টর ৩, কলকাতা ৭০০ ০৯৭
আউটস্টেশন চেকে ৩০ টাকা আরও যোগ করুন
অথবা
NEFT-র মাধ্যমে টাকা পাঠান এই অ্যাকাউন্টে
Sweasthyer Britto, A/c No 0315101025024
Canara Bank, Princep Street Branch
IFSC Code CNRB0000315

সম্পাদকীয়

সারোগেসি বা গর্ভদান

সারোগেসি কথাটা শুনেছেন অনেকেই। মূল ব্যাপারটা এই যে, শিশুর গর্ভধারণ যিনি করবেন, তিনি শিশুর মা নন। গর্ভধারণকারিণী 'মা', তথা সারোগেট 'মা'-এর গর্ভ, বা তাঁর শরীর, ব্যবহার করা হবে অন্য কারও বংশধারা বহন করার জন্য। কয়েক বছর অগেও এটাকে কল্পবিজ্ঞান বলে মনে হতো, কিন্তু এখন এদেশে অনেক সন্তানহীন দম্পতি সারোগেট সন্তানের জনক-জননী হচ্ছেন। সেটা বিজ্ঞানের আশীর্বাদ। আবার এমন অনেক বড়লোক রয়েছেন যাঁরা স্রেফ শখ মেটাতে সারোগেট সন্তান নিচ্ছেন। সত্যি কথা বলতে কী, টাকাপয়সা থাকলে সারোগেট সন্তান নেওয়া বেশ সোজা; গর্ভধারণের ঝক্কি নেই, পয়সা দিলেই ডাক্তারবাবুরা রাজি। আর দু'টো পয়সা দিলেই, সন্তান চাইছেন এমন দম্পতির হয়ে গর্ভধারণের কাজটা করে দেবেন, এ দেশে এমন দরিদ্র মহিলা কিছু কম নন। ব্যাপারটা বে-আইনিও নয়।

তবু প্রশ্ন থেকে যায়। চিকিৎসকের নৈতিকতার প্রশ্ন। চিকিৎসক তাঁর রোগীর স্বার্থে কাজ করবেন, জেনেশুনে এমন কাজ করবেন না যাতে রোগীর দেহের বা মনের ক্ষতি হতে পারে। চিকিৎসা ব্যবস্থার মধ্যে সকলকে সমদৃষ্টিতে দেখার আদর্শ অন্তর্লীন থাকে। হয়তো সে আদর্শ বাস্তবে বারবার লঙ্ঘিত হয়, তবু মানুষ সে আদর্শ কিছুতেই যেন ভুলতে পারে না। পয়সার বিনিময়ে যে মহিলা অন্যের হয়ে গর্ভধারণ করছেন, তিনিই তো চিকিৎসকের রোগী। তাঁর শরীর, তাঁর গর্ভের, তাঁর সন্তানধারণ, তাঁর প্রসব বেদনার দেখভাল করার জন্যই তো চিকিৎসক দরকার। কিন্তু যে চিকিৎসককে নিযুক্ত করেন সন্তানকামী দম্পতি, যাঁর দক্ষিণা চুকিয়ে দেন ওই দম্পতিই, সেই চিকিৎসক তাঁর প্রাথমিক রোগী দরিদ্র ওই মহিলার শরীর-মনের কথাটাই কি সবার আগে ভাবেন?

এই সমাজে কি সেটা ভাবা সম্ভব?

তা হলে সারোগেট 'মা'র ভালোমন্দ সত্যি কেউ দেখছেন কি? আইনই বা কী সুরক্ষা দিচ্ছে তাঁকে? আমাদের এই দেশে সারোগেসি বিলেত আমেরিকার চাইতে ঢের কম পয়সায় করানো যায়, আর সেই কারণেই বহু বিদেশি দম্পতি এদেশে এসে 'ফাইভ স্টার' আরামে থেকে সারোগেট সন্তান কোলে নিয়ে স্বদেশে ফিরছেন। আর অনেক কর্পোরেট হাসপাতাল, অনেক ডাক্তার বহু অর্থ উপার্জন করছেন দেশ-বিদেশের 'ক্লায়েন্ট'-এর সারোগেট সন্তানের ব্যবস্থা করে দিয়ে। তা তাঁরা করুন, কিন্তু এই নতুন 'ইন্ডাস্ট্রি'র একেবারে নীচের তলায় পড়ে থাকা যে 'কাঁচামাল', সেই সারোগেট 'মা' তাঁর ন্যূনতম সুরক্ষা ন্যূনতম সুবিধা, ন্যূনতম অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন না তো?

সারোগেসির আইন আর নৈতিকতা নিয়ে লেখা রইল এই সংখ্যার *স্বাস্থ্যের বৃত্তে*। দেখা যাক পাঠক কী বলেন!

❑ এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত লেখা সাধারণ মানুষের কাছে বিজ্ঞান, বিশেষত চিকিৎসাবিজ্ঞান সম্পর্কে ধারণা পৌঁছে দেবার উদ্দেশ্যে লেখা। এই পত্রিকায় প্রকাশিত লেখার ভিত্তিতে কোনও পাঠক নিজের বা অন্যের চিকিৎসা করার চেষ্টা করবেন না। সে চেষ্টা করলে ফলাফলের দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবেই সংশ্লিষ্ট পাঠকের, পত্রিকার নয়।

ADVERTISEMENT

ধূলিবহুল পরিবেশে যাঁদের কাজ করতে হয়, তাঁরা নানান পেশাগত শ্বাসরোগে ভোগেন।

১. সিলিকোসিস হয় কর্মপরিবেশের বাতাসে সিলিকা থেকে। কয়লা, সোনা, রূপা, দস্তা, অভ্র, ইত্যাদি খনিতে, পটারি ও সিরামিক শিল্পে, পাথর ভাঙা, নির্মান-শিল্প, লোহা ও ইস্পাত শিল্প, ইত্যাদিতে এ রোগ দেখা যায়। ১৯৪৮-এর ফ্যাক্টরি আইন ও ১৯৫২-র খনি আইন অনুযায়ী শ্রমিকের এ রোগ হলে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে জানানোর দায়িত্ব শিল্প বা খনি-মালিকের।

২. এস্ট্রাকোসিস হয় কয়লা খনি শ্রমিকদের। খনি আইনে এ রোগ বিজ্ঞপ্তি-যোগ্য, ১৯৫৯-এর শ্রমিকের ক্ষতিপূরণ আইন অনুযায়ী এ রোগ হলে শ্রমিকের ক্ষতিপূরণ পাওয়ার কথা।

৩. বিসিনোসিস-টেক্সটাইল মিলের শ্রমিকদের ফুসফুসে দীর্ঘ দিন ধরে তুলোর রোঁয়া ঢুকে এ রোগ হয়।

৪. ব্যাগাসোসিস-আখের গুঁড়ো ঢুকে এ রোগ হয় চিনি-শিল্প ছাড়াও কাগজ, কার্ড বোর্ড, রেয়ন শিল্পে।

৫. এসবেস্টোসিস-এসবেস্টস শিল্প-শ্রমিকদের রোগ। এ রোগ ছাড়াও এই শ্রমিকদের ফুসফুসে এক ধরনের ক্যান্সার হয়।

৬. সিডারোসিস-হয় লোহার ধূলো থেকে।

৭. টোব্যাকোসিস-সিগারেট-বিড়ি শিল্পের শ্রমিকদের হয়।

৮. ফার্মার্স লাংগ-ছত্রাকযুক্ত খড় বা শস্যকণা থেকে এ রোগ হতে পারে কৃষির সঙ্গে যুক্ত শ্রমিকদের।

আমাদের দেশে এই রোগগুলোর নির্ণয় ও চিকিৎসার যথাযথ ব্যবস্থা নেই। রোগ হলে ক্ষতিপূরণ মেলে না শ্রমিকদের। ডাক্তারী পাঠ্যক্রমে গুরুত্ব পায় না এই অসুখগুলো।

এই অবস্থা কি বদলাবে না?

জনৈক শুভানুধ্যায়ী দ্বারা প্রচারিত

হার্ট ব্লক ও পেসমেকার

প র্ব : ১

বিপদে পড়েছেন বঙ্কুবাবু। ডাক্তার বলেছেন, হার্ট ব্লক হয়েছে, পেসমেকার বসাতে হবে। পাড়ার সবজান্তা ওস্তাদ ঘণ্টাদা বাজারে দাঁড় করিয়ে বললেন— খুব বাঁচা বেঁচেছিস রে বঙ্কু, পেসমেকারে আর খরচা কত? লাখ দেড়-দুই! আর তোর ব্লকটা যদি তেমন সাংঘাতিক হত, তা হলে তো বাইপাস। মানে তিন-চার লাখ টাকার ধাক্কা! বঙ্কুবাবু কিছুক্ষণ ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থেকে বললেন— ডাক্তাররা যে বলল আমার হার্টের ধমনীগুলো সরু হয়নি মোটেই, বাইপাস বা অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টির প্রশ্নই আসে না? ঘণ্টাদা গম্ভীর গলায় বললেন, ডাক্তাররা ওসব বলেই থাকে। হার্টের ধমনীতে ব্লক হলেই তো অ্যাঞ্জিও, বাইপাস ওসব করতে হয়, জানিস নে? আর তুই নিজেই তো বললি, তোর হার্টে ব্লক হয়েছে। তা হলে? বঙ্কুবাবু বললেন— ওরা যে বলল এটা ধমনীর বন্ধ হয়ে যাওয়া 'ব্লক' নয়, এটা হার্টের মধ্যের ইলেকট্রিক কারেন্ট যাবার সিস্টেমে 'ব্লক'। শুনেই ঘণ্টাদার কী হাসি! 'যা রে বঙ্কু, তুই বরং 'মা তারা ইলেকট্রিক্যালস' থেকে খানিক তার আর দুটো সুইচ কিনে নে। তোর হার্টটা মনে হয় টিউবলাইট!'

আসলে বড়ো বয়সে হার্টের দু'রকম রোগ হয়। একটাতে হৃদ্‌যন্ত্রের রক্ত সরবরাহকারী ধমনীগুলো বন্ধ (ব্লক) হয়ে যায়— তাতে হার্ট অ্যাটাক হয়, অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি, বাইপাস এ সব করতে হতে পারে। অন্যটাতে হৃদ্‌যন্ত্রের নিয়মমাফিক সংকোচন প্রসারণ ঘটানোর জন্য হৃদ্‌পেশিতে ছন্দোবদ্ধ বৈদ্যুতিক উত্তেজনা তৈরি করার কোষকলায় বাধা (ব্লক) হয়। হার্ট ব্লক বলতে আমরা এই দ্বিতীয় ধরনের অসুখকেই বুঝি। হার্ট ব্লক আর তার চিকিৎসায় দরকার পেসমেকার— এসব নিয়ে লিখছেন **ডা. গৌতম মিস্ত্রি।**

প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম পেসমেকার

আমাদের শরীরে রক্তের স্রোত অব্যাহত রাখার জন্য জন্মের কয়েক মাস আগের থেকে মৃত্যুক্ষণ পর্যন্ত বিরামহীন ও সুনিয়ন্ত্রিত ভাবে হৃদ্‌পিণ্ডের স্পন্দন (সংকোচন ও প্রসারণ) জরুরি। রক্তের স্রোতই তো অন্যান্য কাজের সঙ্গে দেহের প্রতিটা অঙ্গপ্রত্যঙ্গে খাদ্য ও অক্সিজেন পৌঁছোনোর দায়িত্বে থাকে। হৃদ্‌পিণ্ডের এই গুরুদায়িত্ব পালনের জন্য প্রয়োজন সুস্থ সবল হৃদ্‌পেশি আর নির্দিষ্ট ছন্দে ও লয়ে তাকে কাজের নির্দেশ দেওয়ার জন্য একটা বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন হৃদ্‌পিণ্ডেরই অংশ যার নাম পেসমেকার। হৃদ্‌পিণ্ডের ডান দিকের ওপরের অংশের বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন কিছু হৃদ্‌পেশির কোষ শরীরের প্রয়োজন অনুযায়ী কখনও দ্রুত আবার কখনও বা ধীর-লয়ে স্বয়ংক্রিয় ও ছন্দোবদ্ধ ভাবে বৈদ্যুতিক আধান (electrical charge) উৎপাদনে ও সমগ্র হৃদ্‌পেশিতে তা সরবরাহে সক্ষম। হৃদ্‌পিণ্ডের এই অংশটাকে প্রাকৃতিক পেসমেকার (natural pacemaker, sino-atrial node) বলে।

- আমাদের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত হৃদ্‌যন্ত্র অবিরাম সংকোচন- প্রসারণের মাধ্যমে দেহের সর্বত্র রক্ত পাম্প করে পৌঁছে দেয়।
- হৃদ্‌যন্ত্রের পুরোটা এক সঙ্গে সংকুচিত হয় না; যখন হৃদ্‌যন্ত্রের দুটো নিলয় সংকুচিত হয়ে শরীরে ও ফুসফুসে রক্ত ঠেলে পাঠায় তখন হৃদ্‌যন্ত্রের অলিন্দ দু'টো প্রসারিত হয় ও দেহ এবং ফুসফুস থেকে ফিরে আসা রক্তকে ঠাঁই দেয়।
- যখন অলিন্দ দু'টো সংকুচিত হয় তখন তাদের ভেতরকার রক্ত প্রবাহিত হয় নিলয় দু'টোতে— তারা তখন প্রসারিত হয়।
- হৃদ্‌যন্ত্রের বিভিন্ন অংশের হৃদ্‌পেশির পর্যায়ক্রমে ছন্দোবদ্ধ সংকোচন-প্রসারণ ঘটার কারণ হল হৃদ্‌পেশিকে বৈদ্যুতিক ভাবে উত্তেজিত করা।

আমাদের ইচ্ছে-অনিচ্ছের প্রভাবমুক্ত এতটা স্বয়ংক্রিয়তা শরীরের অন্য কোনো অঙ্গে দেখা যায় না। আমরা খুশিমতো হাত-পা নাড়াতে পারি, ঘুম পেলেও (ইচ্ছে না হলে) না ঘুমিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারি, এমনকী, প্রশ্বাস নেওয়ার দরকার হলেও কিছুক্ষণের জন্য দম বন্ধ করে থাকতে পারি। কিন্তু ইচ্ছেমতো শরীরের জন্য প্রয়োজনীয় হৃদ্‌স্পন্দনের ক্রিয়ায় হস্তক্ষেপ করতে পারি না। হৃদ্‌স্পন্দনের এই ক্রিয়া শারীরিক প্রয়োজন মতো সম্পূর্ণ রূপে নিয়ন্ত্রণ করে স্নায়ুতন্ত্র ও কয়েকটা উৎসেচক, আমাদের খামখেয়ালিপনা ও ইচ্ছা-অনিচ্ছার প্রভাব মুক্ত ভাবে। প্রাকৃতিক পেসমেকারে উৎপন্ন বৈদ্যুতিক আধান হৃদ্‌পেশির বিশেষ কিছু বৈদ্যুতিক আধানপরিবাহী কোষ সমষ্টির বা তড়িৎ প্রবাহী তন্তুর ('কন্ডাক্টিং টিস্যু' conducting tissue) মাধ্যমে দ্রুত ও সংঘবদ্ধ ভাবে হৃদ্‌পেশিতে ছড়িয়ে পড়ে এমন ভাবে, যাতে হৃদ্‌পিণ্ডের প্রকোষ্ঠগুলো পর্যায়ক্রমে সংকুচিত হওয়ার প্রয়োজনীয় বৈদ্যুতিক উত্তেজনা পায়। হৃদ্‌পিণ্ডের ওপরের অংশে দু'টো (ডান ও বাম অলিন্দ— right ও left

atrium) ও নীচের অংশে দুটো (দক্ষিণ ও বাম নিলয়— right ও left ventricle) প্রকোষ্ঠ আছে। প্রতিটা প্রকোষ্ঠ ক্লান্তিহীন ও বিরামহীন ভাবে সংকোচন ও প্রসারণে সক্ষম মাংসপিণ্ড দিয়ে তৈরি ফাঁপা কক্ষ বিশেষ। প্রতিটা হৃদ্‌স্পন্দনের সময় এক-একটা প্রকোষ্ঠের মাংসপিণ্ডের প্রতিটা মাংসতন্তুকে একসঙ্গে সংকুচিত হতে হয়। যার জন্য প্রতিটা প্রকোষ্ঠের সমগ্র অংশের হৃদ্‌পেশির তন্তুতে প্রয়োজনীয় বৈদ্যুতিক উত্তেজনা এক সঙ্গে সংবাহিত হওয়া জরুরি। তড়িৎপ্রবাহী তন্তু ও তার শাখাপ্রশাখা এই কাজটা করে। সমগ্র হৃদ্‌পিণ্ডের প্রকোষ্ঠগুলো আবার এক সঙ্গে সংকুচিত হলে চলবে না, কারণ তাতে প্রয়োজন মাফিক রক্ত প্রবাহিত হবে না। সঠিক ভাবে রক্ত প্রবাহের জন্য প্রথমে হৃদ্‌পিণ্ডের ওপরের প্রকোষ্ঠ দু'টো (অলিন্দ) ও পরে নীচের প্রকোষ্ঠ দু'টো (নিলয়) সংকুচিত হয়। যখন অলিন্দ সংকুচিত হয়, তখন নিলয় প্রসারিত অবস্থায় থাকে। এর ফলে অলিন্দ থেকে নিলয়ে রক্ত প্রবাহিত হয়। রক্তপূর্ণ হয়ে গেলে নিলয়ের সংকোচনের পালা, যখন দক্ষিণ ও বাম অলিন্দ দুটো প্রসারিত হয়ে যথাক্রমে 'অক্সিজেন নিষ্কাশিত' (deoxygenated) রক্ত বহনকারী হৃদ্‌পিণ্ডের প্রধান দুটো শিরা (superior and inferior vena cava) ও 'অক্সিজেন-যুক্ত' রক্ত বহনকারী ৪টি ফুসফুসের শিরা (pulmonary veins) থেকে রক্তপূর্ণ হতে থাকে। হৃদ্‌পেশির সঙ্কোচনের এই পর্যায়ক্রম তড়িৎ প্রবাহী তন্তুর সঠিক কর্মক্ষমতার ওপর নির্ভরশীল। অলিন্দ

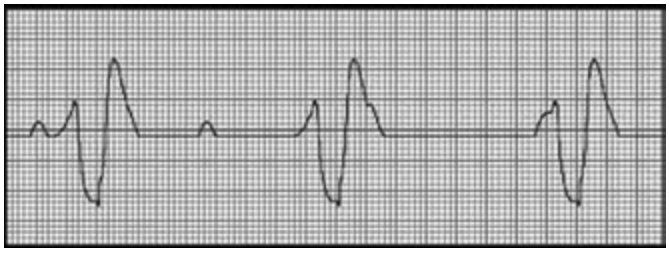

দু'টোকে সংকোচনের জন্য উত্তেজিত করার পরে নিলয় দু'টোকে উত্তেজিত করার মধ্যে কিছুটা বিরামের প্রয়োজন। সেই কারণে অলিন্দকে উত্তেজিত করার পরে বিদ্যুৎ প্রবাহকে স্বল্প সময়ের জন্য অলিন্দ ও নিলয়ের মধ্যের তড়িৎ প্রবাহী তন্তুতে (atrio-ventricular node) কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়। হৃদ্‌পিণ্ডের বহুবিধ রোগের মধ্যে বৈদ্যুতিক আধান উৎপন্ন ও তার যথাযথ প্রবাহের যে রোগসমূহ আমাদের ভোগায় সেগুলোর জন্য অনেক সময় কৃত্রিম বৈদ্যুতিন (ইলেকট্রনিক) পেসমেকার প্রতিস্থাপন করবার দরকার হয়ে পড়ে।

- সারা জীবন ছন্দোবদ্ধ বৈদ্যুতিক উত্তেজনা তৈরি করার জন্য হৃদ্‌যন্ত্রের নিজস্ব স্বাভাবিক পেসমেকার আছে— তার নাম SA নোড।
- সেখান থেকে তড়িৎ-সংবাহক তন্তুর মাধ্যমে বৈদ্যুতিক উত্তেজনা পর্যায়ক্রমে হৃদ্‌যন্ত্রের অলিন্দ ও নিলয়ের সংকোচন ঘটায়।
- বৈদ্যুতিক উত্তেজনা চলে গেলে হৃদ্‌পেশির সংকোচন যথা সময়ে কমে যায়, ফলে অলিন্দ ও নিলয় পর্যায়ক্রমে প্রসারিত হয়।
- SA নোড বা তার পরবর্তী তড়িৎ সংবাহক তন্তুর রোগে হৃদ্‌যন্ত্রের ছন্দোবদ্ধ সংকোচন-প্রসারণ বাধাপ্রাপ্ত হয়।
- সে ক্ষেত্রে হৃদ্‌পেশিকে নিয়মিত ছন্দোবদ্ধ ভাবে বৈদ্যুতিক উত্তেজনা জোগানের জন্য কৃত্রিম পেসমেকার বসানো হয়।

কৃত্রিম পেসমেকার যখন অপরিহার্য :

হার্ট ব্লক নামে এই ভীতিপ্রদ শব্দের সঙ্গে আমরা অল্পবিস্তর পরিচিত। কোনো ব্লকে অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি করতে হয় আবার কোনোটায় পেসমেকার প্রতিস্থাপন করবার প্রয়োজন হয়। ভুল করে কেউ কেউ আবার প্রশ্ন করেন কোন্ ভাল্‌ভ ব্লক হয়ে গেছে? জেনে রাখা যাক, কোনো ধরনের ব্লকেই হৃদ্‌পিণ্ডের রক্তস্রোত নিয়ন্ত্রণকারী একমুখী চারটে ভাল্‌ভের কোনো রোগের সম্ভাবনার কথা বলা হয় না। হৃদ্‌পিণ্ডের মধ্যেকার ভালভের রোগে ভাল্‌ভ ব্লক হয়ে যায় না; ভাল্‌ভের রোগের অন্য কারণ ও অন্য চিকিৎসা আছে। হৃদ্‌পিণ্ডের রক্ত সরবরাহকারী রক্তনালীর রোগের প্রাথমিক পর্যায়ে রক্তনালী আংশিক সরু হয়ে যাওয়ার জন্য পরিশ্রম করার সময় বুকে ব্যথা হয়; সম্পূর্ণ ভাবে বন্ধ হয়ে গেলে হার্ট অ্যাটাক হয়। হার্ট ব্লক বলতে সাধারণত এই রোগের কথাও

বলা হয় না। হৃদ্‌পেশিতে সঠিক ভাবে বৈদ্যুতিক উত্তেজনা পৌছোনোর ব্যাঘাতজনিত রোগই হার্ট ব্লক। হৃদ্‌পেশিকে সঠিক সময় সঠিক ভাবে ক্রিয়াশীল হওয়ার জন্য যে বৈদ্যুতিক উত্তেজনার প্রয়োজন, সেটা ব্যাহত হতে পারে দু'রকম ভাবে— এক, প্রাকৃতিক পেসমেকারে বৈদ্যুতিক আধান উৎপন্ন হওয়ার সমস্যা থাকলে; অথবা দুই, উৎপন্ন হলেও (সঠিক ভাবে উৎপন্ন বৈদ্যুতিক উত্তেজনা) প্রাকৃতিক পেসমেকার থেকে হৃদ্‌পেশিতে সুনিয়ন্ত্রিত ভাবে পরিবহণের পথে বাধা থাকলে। দু'টো কারণেই হৃদ্‌পেশিতে প্রয়োজনীয় বৈদ্যুতিক উত্তেজনা সঠিক ভাবে পৌঁছোতে না পারার ফলে হৃদ্‌স্পন্দন ব্যাহত বা স্তব্ধ হয়ে যায় যতক্ষণ পর্যন্ত পুনরায় স্বাভাবিক বৈদ্যুতিক উত্তেজনা বহাল না হচ্ছে ততক্ষণ হৃদ্‌স্পন্দন ব্যাহত বা স্তব্ধ থাকে। এই স্বাভাবিকতা ফিরে আসার সময়ের একটা ন্যূনতম স্বাস্থ্যকর সময়সীমা আছে। তিন মিনিটের বেশি সময় ধরে হৃদ্‌স্পন্দন স্তব্ধ হয়ে থাকলে মস্তিষ্কের অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে যায়। সেটা মৃত্যুর সামিল বলে গণ্য করা যেতে পারে। বৈদ্যুতিক প্রবাহের এই রোগের বিভিন্ন কারণের মধ্যে বার্ধক্যজনিত (অথবা অকাল বার্ধক্যজনিত) ক্ষয়রোগই (sclero-degenerative) বড়ো কারণ। কখনও কখনও স্বল্প সময়ের পূর্বাভাস পাওয়া গেলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে আক্রান্ত ব্যক্তি হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে যান। পড়ে যাবার ভালোমন্দ দু'টো দিকই আছে। পড়ে গিয়ে আঘাত লাগার ফলে হাত-পা ভেঙে যাওয়া অথবা মাথা ফেটে যাওয়ার ভয় আছে। এই রোগের প্রথমের দিকে অবশ্য স্থায়ী ক্ষতি হয়ে যাওয়ার মতো দীর্ঘ সময়ের জন্য জ্ঞান হারায় না। মানবদেহের অভ্যন্তরীণ আত্মরক্ষামূলক (self-defensive) বৈশিষ্ট্য মাটিতে পড়ে যাওয়ায় সুফল হিসাবে মাধ্যাকর্ষণের সুবিধা ব্যবহার করে শরীরের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ, মস্তিষ্কে যথাসম্ভব বেশি পরিমাণে রক্ত সরবরাহ চলতে থাকে। হৃদ্‌যন্ত্রের অন্যান্য রোগের থেকে হার্ট ব্লকের আলাদা রকমের এক বৈশিষ্ট্য হল, হৃদ্‌স্পন্দন স্তব্ধ হয়ে যাওয়ার ঘটনাগুলো কোনো পূর্বাভাষ ছাড়াই ক্ষণিকের জন্য ঘটে। প্রাণের আশঙ্কার চেয়ে পতনজনিত আঘাতেই বেশি ক্ষতি হয়। এই রোগের কোনো পাকাপাকি নিরাময় আবিষ্কার করা যায়নি। কোনো ওষুধ কাজ করে না। পেসমেকার নামে যন্ত্র প্রতিস্থাপন করতে হয়। প্রাকৃতিক পেসমেকার হিসেবে হৃদ্‌পিণ্ডের ক্ষুদ্র কয়েকটা জীবকোষ জীবনভোর যে কাজ করতে সক্ষম, মানুষের বানানো ব্যাটারিচালিত কৃত্রিম পেসমেকারের ক্ষেত্রে আয়োজন বড়ো কিন্তু কার্যকারিতা তত ভালো নয়।

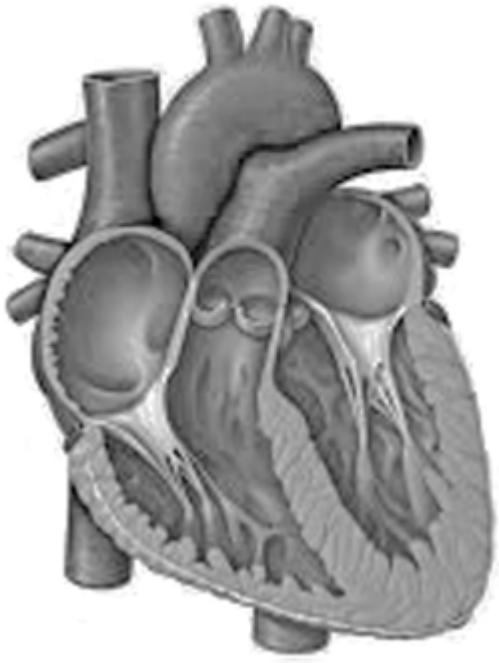

কৃত্রিম পেসমেকারের প্রযুক্তি বিজ্ঞান

কৃত্রিম পেসমেকারের (প্রচলিত কথনে কেবল 'পেসমেকার' বলা হয়ে থাকে) দু'টো অংশ থাকে : ১৫ থেকে ৪০ গ্রাম ওজনের ইলেক্ট্রনিক যন্ত্রাংশ ও দীর্ঘমেয়াদি কর্মক্ষমতা যুক্ত ব্যাটারির সমন্বয়ে গঠিত 'পালস জেনারেটর' আর এতে উৎপন্ন বৈদ্যুতিক শক্তি হৃদ্‌পিণ্ডে পরিবহণ করে নিয়ে যাওয়ার জন্য পরিবাহী তার বা 'ইলেকট্রোড'। চিকিৎসা বিজ্ঞানের ক্রমবর্ধমান অগ্রগতির অঙ্গ হিসাবে বিভিন্ন ধরনের বহুমুখী বৈচিত্র্য ও গুণ সমৃদ্ধ কৃত্রিম পেসমেকারের প্রবর্তন হয়েছে। পেসমেকারের বহুমুখী বৈশিষ্ট্যের ও অতিরিক্ত পরিষেবা অনুযায়ী এর একটা সাংকেতিক নামকরণের প্রথা আছে (NGB Code)। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, ন্যূনতম বৈশিষ্ট্য-সম্পন্ন যে পেসমেকার অধিকাংশ হার্ট ব্লকে প্রয়োজনীয় সুরক্ষা দেয় সেটা হল 'VVI' শ্রেণির। পেসমেকার শ্রেণির সাংকেতিক নামের প্রথম অক্ষরটা (V) নির্দেশ করে হৃদ্‌পিণ্ডের কোন্ প্রকোষ্ঠটিকে কৃত্রিম পেসমেকার উত্তেজিত করবে; এ ক্ষেত্রে দক্ষিণ নিলয় (right Ventricle)। এই শ্রেণির (VVI) পেসমেকারের একটা নির্ণয়মূলক যন্ত্রাংশ দক্ষিণ নিলয়ে সঠিক সময়ে স্বাভাবিক হৃদ্‌স্পন্দনের জন্য প্রয়োজনীয় বৈদ্যুতিক উত্তেজনার উপস্থিতি অহরহ নির্ণয় করতে থাকে। এটা পেসমেকারের নির্ণয়মূলক কাজ (sensing function)। সাংকেতিক নামের দ্বিতীয় অক্ষরটা নির্দেশ করে হৃদ্‌পিণ্ডের কোন্ প্রকোষ্ঠের বৈদ্যুতিক উত্তেজনার উপস্থিতি নির্ণিত হবে; যেটাও এ ক্ষেত্রে দক্ষিণ নিলয় (right Ventricle)। হঠাৎ হার্ট ব্লকের কারণে স্বাভাবিক হৃদ্‌স্পন্দনের জন্য প্রয়োজনীয় বৈদ্যুতিক উত্তেজনার উপস্থিতি নির্ণিত না হলে পেসমেকারের বৈদ্যুতিক আধান প্রস্তুতকারী অংশটা

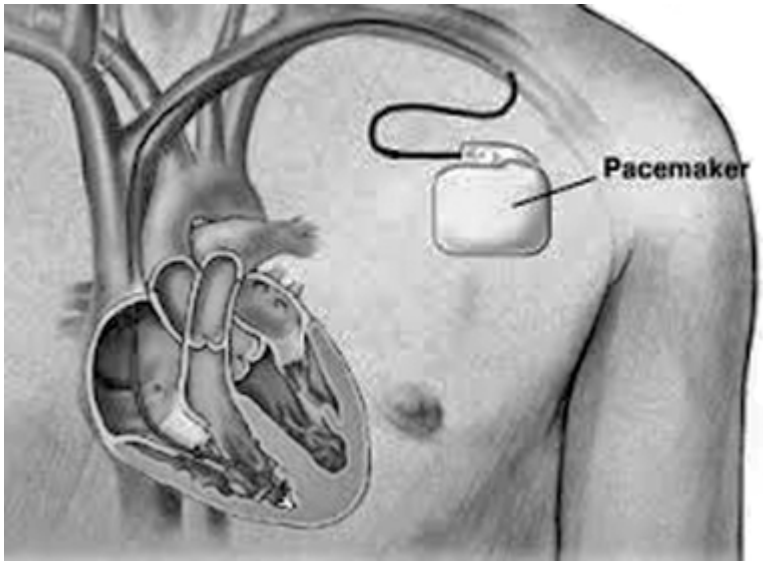

ব্যক্তির শারীরিক কর্মক্ষমতার প্রয়োজন অনুযায়ী পূর্ব নির্ধারিত লয়ে ও মাত্রায় বৈদ্যুতিক উত্তেজনা প্রস্তুত করতে থাকে (pacing function)। শিরার মধ্য দিয়ে বয়ে যাওয়া বিদ্যুৎ পরিবাহী তার (pacing lead) সেই বৈদ্যুতিক আধান প্রস্তুতকারী অংশটা ব্যক্তির শারীরিক কর্মক্ষমতার প্রয়োজন অনুযায়ী পূর্বনির্ধারিত লয়ে ও মাত্রায় বৈদ্যুতিক উত্তেজনা দক্ষিণ নিলয় পৌঁছে দিয়ে হৃদ্‌পেশির সংঘবদ্ধ সংকোচন প্রক্রিয়া শুরু করে। পেসমেকারের কর্মপদ্ধতিকে বাড়ির সুরক্ষার জন্য নিযুক্ত বিশ্বস্ত পাহারাদার কুকুরের (watch dog) সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। অধিকাংশ সময়ে কুকুরটা নিঃশব্দে পাহারায় থাকে (sensing function-এর মতো), চোর ডাকাতের উদয় হলেই নির্ভুল ভাবে তার কাজ করতে থাকে (pacing function-এর মতো)। পেসমেকারের শ্রেণির নামের তৃতীয় অক্ষরটা (I, inhibitory) নির্দেশ করে, হৃদ্‌স্পন্দনের স্বাভাবিক উত্তেজনা নির্ণীত হলে (sensed) কৃত্রিম পেসমেকারের বৈদ্যুতিক উত্তেজনা প্রস্তুতকারী অংশটি (pacing component) প্রশমিত থাকবে (যেমন VVI শ্রেণির পেসমেকারের ক্ষেত্রে)। তৃতীয় সংকেতটি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই শ্রেণির, যদিও অন্য ধরনেরও হওয়া সম্ভব (T-উত্তেজনা সৃষ্টিকারী বা, Triggered, D-দ্বিবিধ, Dual Triggered plus Inhibited)। কিছু কিছু শ্রেণির পেসমেকারের চতুর্থ ও পঞ্চম বৈশিষ্ট্যও থাকে। প্রতিস্থাপনের পরবর্তী কালে, শরীরের বাইরে থেকে (বেতার তরঙ্গের দ্বারা) হৃদ্‌স্পন্দনের কর্মপদ্ধতির নির্দেশিকার পরিবর্তন করার বৈশিষ্ট্য (programmability), অথবা অপরিবর্তনশীল বৈদ্যুতিক উত্তেজনার মাত্রার বদলে শারীরিক শ্রমের প্রয়োজনে আনুপাতিক হারে পরিবর্তনশীল (Rate responsive or, modulation) পেসমেকারের সংকেতের চতুর্থ স্থানে উল্লেখিত হয়। যেমন VVIR, DDDRI এ ক্ষেত্রে 'R' সংকেতটা নির্দেশ করে 'Rate modulation' --- অর্থাৎ, রোগমুক্ত অবস্থার অনুকরণে শারীরিক পরিশ্রম-জনিত প্রয়োজনে পরিবর্তনশীল মাত্রায় হৃদ্‌স্পন্দনের জন্য প্রয়োজনীয় বৈদ্যুতিক উত্তেজনা সৃষ্টিক্ষম পেসমেকার। শেষ ও পঞ্চম সংকেতটা সংরক্ষিত আছে হঠাৎ দ্রুতলয়ে হৃদ্‌স্পন্দন-জনিত রোগের (tachycardia) চিকিৎসা হিসাবে পেসমেকারের কর্মক্ষমতা (anti-tachycardia function) উল্লেখের জন্য। অপ্রাসঙ্গিক ও অপেক্ষাকৃত জটিল বলে নবতম প্রজন্মের অত্যাধুনিক বৈশিষ্ট্যওয়ালা পেসমেকারের সাংকেতিক চিহ্নের বিশদ আলোচনা এই নিবন্ধে অপ্রাসঙ্গিক। এক কথায় বলা যায় যে, পেসমেকারে যত বেশি বৈশিষ্ট্য থাকবে, তত বেশি তার দাম হবে, তত তাড়াতাড়ি পেসমেকারের ব্যাটারি ফুরিয়ে যাবে, তত বেশি যান্ত্রিক গোলযোগ হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। অন্যান্য চিকিৎসা সামগ্রীর মতো পেসমেকারের ক্ষেত্রেও তাই দামি মডেলই বেশি ভালো এটা মনে করার কোনো কারণ নেই।

> বুকের ওপরের দিকে ক্ল্যাভিকল নামক হাড়ের নীচে ডান বা বাম দিকে চামড়ার নীচে পালস জেনারেটার প্রতিস্থাপন করাহয়।

রোগের কারণে হৃদ্‌পিণ্ডের স্বাভাবিক স্পন্দন সাময়িক ভাবে বন্ধ হয়ে গেলে পালস জেনারেটারের নজরদারি করতে সক্ষম যন্ত্রাংশ (sensing component) প্রথমে সেটা নির্ণয় করে ও পেসমেকারের বৈদ্যুতিন নির্দেশিকা (electronic program) অনুযায়ী বৈদ্যুতিক আধান প্রস্তুতকারী অংশকে (pacing component) কাজ শুরু করার প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেয়। এমতাবস্থায় পেসমেকার পূর্ব নির্ধারিত ও শরীরের চাহিদা অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময় অন্তর বৈদ্যুতিক উত্তেজনার প্রবাহ (electrical impulse) উৎপন্ন করতে শুরু করে। এই বৈদ্যুতিক উত্তেজনা পরিবাহী তারের মাধ্যমে হৃদ্‌পেশিতে পৌঁছে যায় ও কৃত্রিম উপায় হৃদ্‌স্পন্দন শুরু হওয়ার প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়া শুরু করে দেয়। স্বাভাবিক হৃদ্‌স্পন্দন শুরু হয়ে গেলে, পেসমেকারের নজরদারির দায়িত্বে থাকা যন্ত্রাংশ সেটা নির্ণয় করে সক্রিয় বৈদ্যুতিক আধান প্রস্তুতকারী অংশকে প্রশমিত করে। হৃদ্‌স্পন্দনের যে কোনো রকম ব্যাঘাতে পেসমেকার কাজ করতে পারে না। সুস্থ স্বাভাবিক হৃদ্‌স্পন্দনের জন্য চাই— (১) সুস্থ হৃদ্‌পেশি, (২) কর্মক্ষম রক্তচলাচল নিয়ন্ত্রণকারী চারটে একমুখী হৃদ্‌পিণ্ডের ভাল্‌ভ, (৩) উপযুক্ত পরিমাণের ও সঠিক চাপযুক্ত রক্ত, ও (৪) সর্বোপরি, উপযুক্ত ছন্দে ও মাত্রায় বৈদ্যুতিক উত্তেজনা। প্রথম তিনটে অবস্থা মজুত থাকলেও শেষোক্ত প্রয়োজনটির অভাব ঘটলে কেবল তবেই কৃত্রিম পেসমেকার প্রায় স্বাভাবিক হৃদ্‌স্পন্দন নিশ্চিত করতে পারে। ইদানীং কিছু অন্য ধরনের পেসমেকার (biventricular pacing) বৈদ্যুতিক উত্তেজনার অভাব না ঘটালেও হৃদ্‌পেশির উপযুক্ত ও সংঘবদ্ধ (synchronous) সংকোচন প্রক্রিয়ার অভাব-জনিত রোগে (heart failure) রোগকষ্টের উপশম ঘটায়। আবার পেসমেকারের সঙ্গে ডিফিব্রিলেটার জুড়ে (টু-ইন-ওয়ান) ইমপ্লান্টেবল কার্ডিওভার্টার ডিফিব্রিলেটার (AICD, automated implantable cardioverter defibrillator) আবিষ্কৃত হয়েছে। হঠাৎ তীব্র গতিতে অস্বাভাবিক ছন্দে হৃদ্‌পিণ্ডের বৈদ্যুতিক উত্তেজনায়

> বহু রকমের শ্রেণির ও বিস্তর ফারাকওয়ালা দামের (৪০ হাজার থেকে দেড় লাখ টাকা) মধ্য থেকে রোগীর পক্ষে পেসমেকার চয়ন এক রকম অসম্ভব,

হৃদ্‌স্পন্দন স্তব্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে (ventricular fibrillation) যে মারাত্মক অবস্থা উপস্থিত হয়, তাতে এই ধরনের পেসমেকারই একমাত্র নির্ভরযোগ্য সুরক্ষা দেয়। সে আলোচনা আপাতত মুলতুবি থাক। আমরা হার্ট ব্লক বা হৃদ্‌স্পন্দনের জন্য প্রয়োজনীয় উপযুক্ত বৈদ্যুতিক উত্তেজনা সৃষ্টি ও তার সঠিক সংবহনের ব্যাঘাতে হৃদ্‌স্পন্দনের স্তব্ধ হয়ে যাওয়ার রোগে কৃত্রিম উপায়ে প্রতিস্থাপিত পেসমেকারের কাজের আলোচনায় থাকব। হার্ট ব্লকের চেয়ে হার্টের ইস্কিমিক রোগের (ischaemic heart disease) প্রাদুর্ভাব বেশি। শেষোক্ত রোগে বুকে ব্যথা হয় বা হার্ট অ্যাটাক হয়। ইস্কিমিক হার্টের রোগে হৃদ্‌পেশিতে রক্তসরবরাহকারী রক্তনালী আংশিক বা পুরো মাত্রায় বন্ধ হয়ে যায় আর তার চিকিৎসার প্রয়োজনে কখনও কখনও (করোনারি) অ্যাঞ্জিওগ্রাম করা হয়ে থাকে যেটাও এক অন্য ধরনের (রক্তনালীর) ব্লক। রক্তনালীর ব্লকে বা হৃদ্‌পিণ্ডের ভাল্‌ভের রোগে পেসমেকার কোনো কাজে আসে না।

> হৃদপেশিতে সঠিক ভাবে বৈদ্যুতিক উত্তেজনা পৌছনোর ব্যাঘাতজনিত রোগই হার্ট ব্লক।

পেসমেকার প্রতিস্থাপন প্রক্রিয়া :

সাধারণত বুকের ওপরের দিকে ক্ল্যাভিকল নামক হাড়ের নীচে ডান বা বাম দিকে চামড়ার নীচে পালস জেনারেটর প্রতিস্থাপন করা হয়। এটা করার জন্য অজ্ঞান করার প্রয়োজন হয় না, বুকের চামড়ার ওই অংশটা ইঞ্জেকশন দিয়ে অবশ করে নিলেই চলে। পালস জেনারেটর থেকে বৈদ্যুতিক উত্তেজনা বহনকারী তারটা হৃদ্‌পিণ্ডের প্রধান শিরাগুলোর একটার মধ্যে দিয়ে হৃদ্‌পিণ্ডের নীচের ডান দিকের প্রকোষ্ঠের (দক্ষিণ নিলয়, right ventricle) সর্বনিম্ন প্রান্তে পৌঁছে দেওয়া হয়। এখান থেকেই কৃত্রিম পেসমেকারের বৈদ্যুতিক উত্তেজনা হৃদ্‌পিণ্ডের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। পেসমেকার প্রতিস্থাপন প্রক্রিয়াটা হৃদ্‌পিণ্ডের অন্যান্য শল্য চিকিৎসার তুলনায় অপেক্ষাকৃত সহজ, ঝুঁকিহীন, প্রায় ১০০ শতাংশ সফল এবং স্বল্প সময়ে ও স্বল্প আয়াসে প্রয়োগ করা যায়।

অস্থায়ী ও স্থায়ী কৃত্রিম পেসমেকার

ইস্কিমিক হার্ট ডিজিজের এক রূপ হিসাবে রোগগ্রস্ত রক্তনালীতে হঠাৎ রক্ত জমাট বাঁধার ফলে ''হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত'' বা 'হার্ট অ্যাটাকের'' (acute myocardial infarction) রোগে কখনও কখনও সাময়িক সময়ের জন্য বৈদ্যুতিক উত্তেজনা হৃদ্‌পেশিতে ছড়িয়ে পড়ার সমস্যা উপস্থিত হয়। সে ক্ষেত্রে সাময়িক সময়ের জন্য অস্থায়ী পেসমেকারের (temporary pacemaker) সাহায্য নিতে হয়। সাময়িক সময়ের জন্য পেসমেকার আয়তনে বড়ো, বাজারে উপলব্ধ সাধারণ ব্যাটারিচালিত ও শরীরের বাইরে থেকে অপেক্ষাকৃত লম্বা বিদ্যুৎ পরিবাহী তারের মাধ্যমে হৃদ্‌পিণ্ডের দক্ষিণ নিলয়ের নিম্নতম অংশকে উত্তেজিত করে। রোগীকে হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে থাকতে হয়। স্থায়ী হার্ট ব্লকে আক্রান্ত রোগীদের একাংশের রোগ নির্ণিত হওয়ার সময়ে এমন সংকটজনক পরিস্থিতি তৈরি হয় যে, স্থায়ী পেসমেকার প্রতিস্থাপনের আগে প্রস্তুতিপর্বের যে ন্যূনতম সময় প্রয়োজন, সে সময়ও প্রাণের আশঙ্কা থেকে যায়। এমতাবস্থায় স্থায়ী পেসমেকার প্রতিস্থাপনের আগে জরুরি ভিত্তিতে অস্থায়ী পেসমেকার প্রতিস্থাপন করা হয়ে থাকে। আবার স্থায়ী পেসমেকার প্রতিস্থাপনের আগে পেসমেকারের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে সন্দেহ থাকলে অস্থায়ী পেসমেকার প্রতিস্থাপন করে প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও নজরদারি পূর্ণ করে নিশ্চিত হয়ে তবেই স্থায়ী পেসমেকার প্রতিস্থাপন করা হয়। যেহেতু হার্ট ব্লকের সম্পূর্ণ নিরাময় সম্ভব নয়, পেসমেকার প্রতিস্থাপনের দ্বারা কেবল কিছু কুসময়ের জন্য স্বাভাবিক হৃদ্‌স্পন্দনের প্রয়োজনীয় বিকল্প, তাই রোগীকে আজীবন পেসমেকারের বোঝা বয়ে বেড়াতে হয়। পেসমেকারের তড়িৎশক্তি উৎপাদনকারী ব্যাটারির সীমিত আয়ু থাকে বলে পেসমেকারের মডেল ও ব্যবহারকারী রোগীর প্রয়োজনভিত্তিক খরচ অনুযায়ী সাধারণত ৮ থেকে ১৫ বছরের পরে ব্যাটারির শক্তি নিঃশেষিত হয়ে যাওয়ার জন্য শক্তিহীন পুরোনো পেসমেকার পাল্টে নতুন পেসমেকার প্রতিস্থাপনের প্রয়োজন হয়। এই প্রক্রিয়া চলতে থাকে আজীবন।

পেসমেকার প্রতিস্থাপনের ব্যবসায়িক দৃষ্টিকোণ :

'পেসমেকার বসাতে হবে' এই শব্দসমষ্টি রোগীর আত্মীয়- স্বজনের হৃদ্‌স্পন্দন হঠাৎ বাড়িয়ে দেয়, যদিও রোগীর ক্ষেত্রে এটা স্থায়ী ভাবে হলে সস্তায় রোগোপশম হত! পেসমেকার প্রতিস্থাপন প্রক্রিয়ায় ঝুঁকি বা অনিশ্চয়তা শুধু নয়, কোনও রকম প্রস্তুতির সুযোগ না দিয়ে বড়ো রকমের আর্থিক বোঝাও দুশ্চিন্তার কারণ। এটা একটা স্বাভাবিক প্রবণতা যে, চিকিৎসার দরকারে যে পার্থিব বস্তুসমূহের প্রয়োজন হয়, সেগুলো এতটাই 'টেকনিক্যাল' বা সাধারণের দুর্বোধ্য, সাক্ষর মানুষরাও এক রকম চোখ বুজেই ওষুধ ও চিকিৎসাসামগ্রী কিনে থাকেন। আবার প্রয়োজনীয় সচেতনতার অভাবে ওষুধের নাম না পড়েই এবং চিকিৎসা নিদান পড়ার বিড়ম্বনায় না গিয়ে ওষুধের দোকানের সেলসম্যানের (যে কি না অনেক সময় রোগীর চেয়ে প্রথাগত ভাবে কম

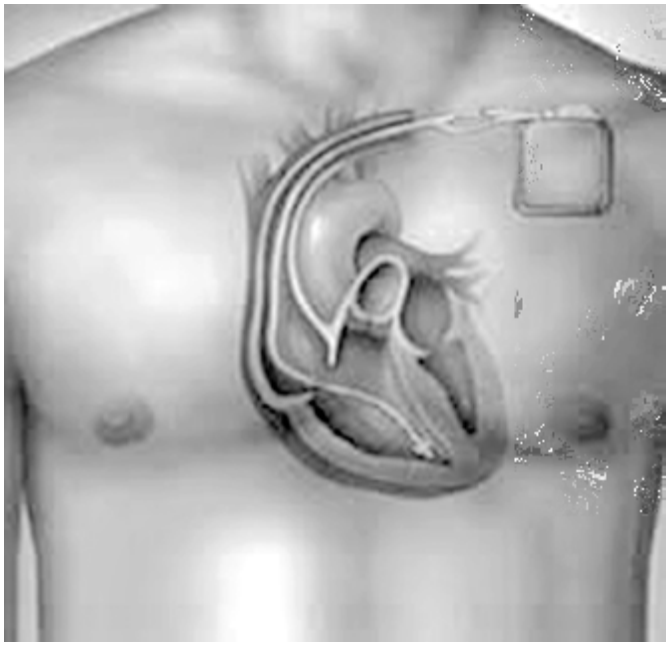

শিক্ষিত) আধাস্পষ্ট করে বলে দেওয়া নির্দেশ অনুযায়ী চিকিৎসা চালান। এই প্রবণতাকে পাথেয় করে ক্রমে গড়ে উঠেছে চিকিৎসক আর পেসমেকার বিক্রেতা এজেন্টদের এক অসাধু চক্র। বহু রকমের শ্রেণির ও বিস্তর ফারাকওয়ালা দামের (চল্লিশ হাজার থেকে দেড় লাখ টাকা) মধ্যে থেকে রোগীর পক্ষে পেসমেকার চয়ন এক রকম অসম্ভব, তেমনি অসম্ভব বিক্রেতার কাছ থেকে সেটা প্রতিযোগিতামূলক দামে কিনে সেটা প্রতিস্থাপনের বন্দোবস্ত করা। এক রকম বিপাকে পড়েই রোগী চিকিৎসক, হাসপাতাল ও পেসমেকার বিক্রেতাদের কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হন। (সেটাই বোধ হয় রোগীর ও তার আত্মীয়ের সঠিক প্রতিক্রিয়া।) এমনটা খুবই সম্ভব, পেসমেকারের প্রয়োজন আছে এমন এক রোগী যদি দু'জন চিকিৎসকের কাছে পরামর্শ গ্রহণ করেন, তা হলে একই মডেল একই নির্মাতার পেসমেকারের প্রেসক্রিপশন ও সমমানের খরচের নিদান পাবেন না। অর্থাৎ, যদিও পেসমেকারের নির্বাচনের ক্ষেত্রে চিকিৎসা বিজ্ঞান মোটামুটি একটা রূপরেখা দেয়, চিকিৎসা নিদান প্রদানকারী ব্যক্তি বা সংস্থার বিস্তর স্বাধীনতা থাকে, যেটার ক্ষমতা সে সহজে হারাতে চায় না। বিশেষ নির্মাতা ও বিশেষ মডেলপ্রীতির আনুগত্য উপযুক্ত ভাবে চিকিৎসক ও চিকিৎসা সংস্থাকে খুশি করায় কার্পণ্য করে না। চিকিৎসা পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থার প্রতি কঠোর প্রশাসনিক নির্দেশ রোগীর সংকটজনিত উৎকণ্ঠার কাছে হার মেনে যায়। তাই রোগী বনাম উপভোক্তাদের সচেতনতা বাড়ানো ছাড়া বোধহয় অন্য কোনো উপায় নেই।

স্বাস্থ্যের বৃত্তে পেসমেকার-এর দ্বিতীয় পর্বে বিভিন্ন শ্রেণির পেসমেকারের বৈশিষ্ট্য, কর্মপদ্ধতি, প্রয়োজনীয়তা, খরচ-প্রাপ্তির তুল্যমূল্য বিচার, বাজারের পরিচালিকা শক্তি ও অপরিহার্যতা নিয়ে আলোচনার ইচ্ছে রইল।

লেখক পরিচিতি : ডা. গৌতম মিস্ত্রী, এমবিবিএস, এমডি, ডিএম (কার্ডিয়োলজিস্ট), হৃদ্‌রোগবিশেষজ্ঞ। প্রাইভেট প্র্যাকটিস করেন।

advertisement.

একক মাত্রা

গদ্য প্রবন্ধের এক আধুনিক ক্যানভাস

সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি, স্বাস্থ্য, মিডিয়া ও বিবিধ বিষয়ে এক অন্যতর গবেষণা ও আলোচনাপত্র

পাওয়া যাচ্ছে প্রায় সমস্ত স্টলে গ্রাহক চাঁদা:১০০ টাকা (বার্ষিক), ২০০ টাকা (বার্ষিক), ২০০০ টাকা (আজীবন)

আজীবন গ্রাহকেরা পুরনো সংখ্যার একটি সেট বিনামূল্যে পাবেন. যোগাযোগ : ১৫০, মুক্তারাম বাবু স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০০৭

দূরভাষ : ৯৮৩০২৩৬০৭৬ / ৯৮৩০৪৯৩২৩৯

advertisement.

অনীক

'অনীক' পত্রিকা ৫০ বছরে পেরিয়েছে। এই দীর্ঘ সময় ধরে অনীক চেষ্টা করেছে সমসাময়িক গণতান্ত্রিক ও বিপ্লবী রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার অংশ হতে। 'অনীক'-এর বয়োপ্রাপ্তির ইতিহাস তাই সমকালীন গণ-আন্দোলনের চলমান দর্পণও বটে। কোনো বিশেষ দল বা গোষ্ঠীর মুখপত্র না হয়েও, সামাজিক দায়বদ্ধতার অঙ্গীকারে অবিচল থেকে সমকালীন রাজনীতি-অর্থনীতি ও সামাজিক প্রক্রিয়াকে ব্যাখ্যা করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে— রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রাসঙ্গিক প্রবন্ধ ছাড়াও গল্প-কবিতা-নাটক ইত্যাদির মাধ্যমে।

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা ১৫০ টাকা (সডাক)

অনীক, প্রযত্নে : পিপলস বুক সোসাইটি। ১০/২ বি রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট। কলকাতা - ৭০০০০৯

ফোন—৯৪৩২৮৭৭৫৬০/৯৮৩০১৪৩৩৬৫/৯৪৩৩৭২৪৪৬২

advertisement.

উৎস মানুষ

বিজ্ঞান, সমাজ ও সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকা

প্রাপ্তিস্থান :

দীপক কুণ্ডু, ২৯/৩, শ্রী গোপাল মল্লিক লেন, কলকাতা-১২ বই-চিত্র (কফি হাউসের তিন তলা), পাতিরাম, বুক মার্ক, অমর কোলে (বিবাদী বাগ), দিলীপ মজুমদার (ডেকার্স লেন), সুনীল কর (উল্টোডাঙা), কল্যাণ ঘোষ (রাসবিহারী মোড়), সৈকত প্রকাশন (আগরতলা), র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন (বেনিয়াটোলা লেন, কলেজ স্ট্রীট), মনীষা গ্রন্থালয় (কলেজ স্ট্রিট), বইকল্প, ১৮ বি, গড়িয়াহাট রোড (সাউথ), কলকাতা-৭০০০৩১।

যোগাযোগ : ই-মেল- utsamanush1980@gmail.com

ফোন- ৯৮৩০৬৫৯০৫৮/৯৪৩৩৮৮৮৮৬২/৯৮৩১৪৬১৪৫৬

ছানি অপারেশন

দেশি/বিদেশি IOL কোন্‌টা ভালো? কেন ভালো?

ইন্ট্রাকুলার লেন্স (IOL) যা ছানি অপারেশনের সময় চোখের মধ্যে প্রতিস্থাপন করা হয়, তার সম্বন্ধে প্রথমেই বলা ভালো যে মানুষের চোখের মধ্যে যে জন্মগত লেন্সটা থাকে সব চেয়ে ভালো অত্যাধুনিক IOLটাও গুণগত ভাবে তার থেকে এখনও অনেকটাই পিছিয়ে।

সাধারণ ভাবে ধরে নেওয়া হয় আর পাঁচটা আধুনিক বিজ্ঞানলব্ধ জিনিসের মতো বিদেশি IOL-ও দেশি কোম্পানিগুলোর তৈরি IOL-এর চেয়ে ভালো। তবে এক্ষেত্রে ব্যাপারটা বিবেচনাসাপেক্ষ—লিখছেন

ডা. সোহম সরকার।

ছানি অপারেশন করে জন্মসূত্রে পাওয়া প্রাকৃতিক লেন্সটা প্রতিস্থাপিত করে কৃত্রিম লেন্স বসানো হয়। দামি-কমদামি, দেশি-বিদেশি নানা রকম কৃত্রিম লেন্স বসানো যেতে পারে। আমরা সাধারণ ভাবে ধরে নিই, দামি, বিদেশি লেন্স নিশ্চয়ই ভাল লেন্স। কিন্তু ধারণাটা কি এতই সরল? না কি এটা বিদেশি কোম্পানিগুলির প্রচার ও বাজারের দাবি? দামি জিনিস বিক্রি করলে লাভ বেশি।

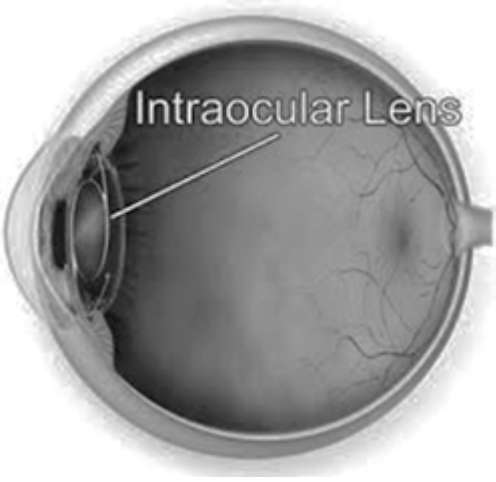

কাকে ভালো বলব?

নিরপেক্ষ (এবং বিজ্ঞানসম্মত) ভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হলে কিছু তথ্য দরকার--- ভালো IOL-এর মানে কী? তার কী কী গুণ থাকতে হবে? তবে প্রথমেই আমরা ধরে নিচ্ছি ভালো IOL হল জন্মগত (যাকে বলে crystalline) লেন্সটার ভালো অনুকরণ।

IOL গুলো প্রধানত দুই ধরনের— শক্ত যা ভাঁজ করে ছোটো করা যায় না (Rigid), এবং নরম বা ভাঁজ করে ছোটো করে চোখের ভেতরে ঢোকানো যায়— সেখানে খুলে গিয়ে আবার বড়ো হয় (Foldable)। এই ক্ষেত্রে মতামত পরিষ্কার—Foldable IOL অবশ্যই ভালো কারণ সেটা চোখের ওপর ছোটো একটা কাটা (incision) এর মধ্যে দিয়ে ঢোকানো যায়। ছোটো কাটা হলে অপারেশনের পরে সেরে উঠতে সময় কম লাগে, সংক্রমণ বা ইনফেকশনের সম্ভাবনাও কম। মনে রাখা দরকার, আমরা 'আদর্শ' (Ideal) অবস্থা বিচার করছি। বাস্তব (Practical) অবস্থা ভাবলে অবশ্য SICS পদ্ধতিতে খুব কম সময়ে অনেক অপারেশন কম দামে (১-২ হাজার টাকায় ভর্তুকি ছাড়া) করা যেতে পারে— এই অবস্থাতে সাধারণত শক্ত (Rigid) IOL লাগানো হয়।

এছাড়া ভালো IOL-এর আর যা যা গুণ থাকে তা হল - Asphericity, Minimum abberations, Bio-compatibility, Good Memory, UV-ray blocking capability, PCO-prevention by design ইত্যাদি। এই কথাগুলোর বাংলা প্রতিশব্দ বসানোর চেষ্টা করছি না, কারণ ব্যাপারগুলো খুব টেকনিক্যাল। বাংলা শব্দ বললেও তার বিরাট ব্যাখ্যা করতে হবে। তৈরির জিনিস (Material) অনুযায়ী IOL সাধারণত দুই প্রকার, হাইড্রোফোবিক এবং হাইড্রোফিলিক। দু'টোর কিছু নিজস্ব সুবিধা আছে, তবে সাধারণত হাইড্রোফোবিক-কেই ভালো ধরা হয়।

এরপর আসে অত্যাধুনিক IOL–Multifocal, Accomodative এবং Toric। Toric IOL সিলিন্ড্রিক্যাল পাওয়ারকেও ঠিক করতে পারে, বাকি দু'টোর ক্ষেত্রে অপারেশনের পরে কাজের জন্য চশমা ব্যবহারের দরকার প্রায় পড়ে না।

বাজারে কী কী IOL পাওয়া যায়

এবারে কী কী লেন্স বাজারে পাওয়া যায় সেটা দেখি। **বিদেশি** IOL কোম্পানির চারটে 'জায়ান্ট'—

১. Alcon--- এরা কেবলমাত্র ফোল্ডেবল লেন্সই তৈরি করে, আর সেগুলো প্রায় সব গুণান্বিত লেন্স। খালি এদের কোনও accommodative IOL নেই।

২. Abbott---শুধু Foldable, এদের লেন্স-এর রেঞ্জ মোটামুটি Alcon-এরই মতো।

৩. Bosch & Lomb (B&L) — সর্বোচ্চ দামের IOL, accommodative IOL। এতে একটা চোখে সাধারণত ১-১.৫ লাখ টাকা খরচ হয়।

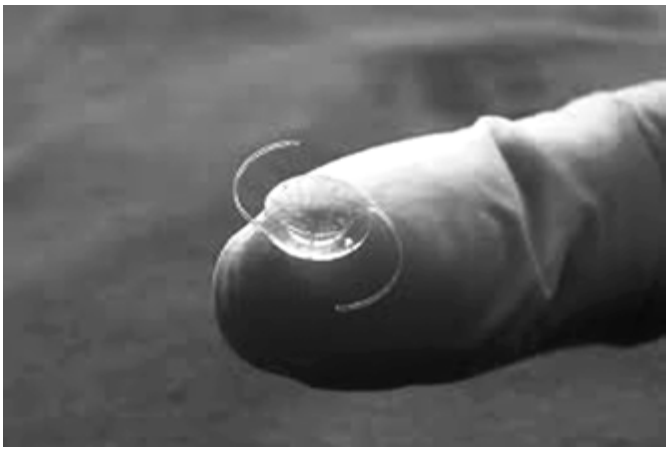

৪. Rayuer— বিশ্বের প্রথম IOL তৈরি করা কোম্পানি। সব রকম লেন্সই তৈরি করে। দাম অন্য তিনটের তুলনায় কম।

দেশি IOL কোম্পানিগুলো—

১. Appaswami— অত্যন্ত বেসিক, কম খরচের IOL। এদের তৈরি সব থেকে কম দামি IOL কিনতে ডাক্তারের বা হসপিটালের খরচ পড়ে পঞ্চাশ টাকা মতো।

২. Intra Ocular Care— কম দামি থেকে মাঝারি দামি। Foldable IOL-ও তৈরি করে।

৩. Aurolab— শ্রী অরবিন্দের অনুগামীদের তৈরি প্রতিষ্ঠান। সব থেকে নামকরা দেশি IOL কোম্পানি। এদের তৈরি আধুনিক IOL গুলোতে সমস্ত ভালো IOL গুণগুলো বর্তমান।

কীসে কত খরচ?

SICS পদ্ধতিতে অপারেশন করে Rigid IOL ব্যবহার করলে প্রতিষ্ঠানের খরচা সাধারণত ১ হাজার থেকে ২ হাজার টাকার মতো হয়। প্রতিষ্ঠান সাধারণত রোগীর কাছ থেকে দেড় হাজার থেকে দশ হাজার টাকা নিয়ে থাকে। দেশি লেন্স ব্যবহার হয়। আগে বিদেশি কোম্পানিরা Rigid IOL তৈরি করত, আজকাল আর প্রায় করে না।

Phaco পদ্ধতিতে অপারেশনে দেশি IOL লাগালে রোগীর সাধারণত সাড়ে ৪ হাজার থেকে ১২ হাজার টাকা লাগে। Rayuer-এর জন্য 'প্যাকেজ' মোটামুটি ১২-১৪ হাজার। Alcon-এর সাধারণ লেন্সগুলোতে ১৫-২৫ হাজার, Abott-এর ১৫-২৫ হাজার, B&L-এর ১৫-৩৫ হাজার।

সব শেষে কোনটা বাছব?

Toric IOL-এর জন্য খরচা পড়ে ৩০ হাজারের ওপর এবং Multifocal-এর ৪০-৫০ হাজার। B&L-এর Accomodative IOL (নাম crystalens)-এর খরচ লাখের ওপর।

এবারে আসল প্রশ্ন— বিদেশি বা দামি IOL লাগালে কি বেশি ভালো দেখা যায়? পরিষ্কার উত্তর— 'না'। দেশি IOL লাগালে তা পরে সমস্যা করতে পারে? উত্তর আবার 'না'।

যদিও অনেক সমীক্ষাতে দেখা গেছে খুব সূক্ষ্ম কিছু সমস্যা দেশি IOL-এ বেশি হয়, তবে সেগুলো প্রাত্যহিক জীবনের জন্য খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ নয়, এবং সেই সব সমীক্ষার নিরপেক্ষতা সন্দেহের উর্দ্ধে নয়।

তবে এটাও সত্যি যে অত্যাধুনিক প্রযুক্তির (যেমন Multifocal বা Toric) IOL দেশি প্রযুক্তিতে তৈরি হলেও তার দামও প্রায় বিদেশি কোম্পানির সমানই পড়ে এবং তাদের সপক্ষে যতগুলো বৈজ্ঞানিক নিরপেক্ষ সমীক্ষা থাকা উচিত, তা নেই।

সরলীকৃত সিদ্ধান্ত বিদেশি IOL গুলোর দাম বেশি তবে জিনিস খারাপ নয়, দেশিগুলো দাম (কম কিছু ক্ষেত্রে একটু বেশি) গুণমানে ভালো। তবে দেশি লেন্সগুলোর মধ্যে সর্বোত্তমগুলোর 'ভালত্ব' ততটা প্রমাণিত নয়।

কাজেই ছানি অপারেশনের সময় কোনও IOL লাগাবেন, এই প্রশ্নের সমাধান ডাক্তার তথা প্রতিষ্ঠান এবং রোগী দুই পক্ষেরই সময়সাপেক্ষ বিবেচনা দাবি করে।

লেখক পরিচিতি : ডা. সোহম সরকার, এমবিবিএস, এমএস, চক্ষুরোগ বিশেষজ্ঞ। প্রাইভেট প্র্যাকটিস করেন। শ্রমজীবী মানুষের জন্য গড়ে ওঠা একটা ক্লিনিকের সঙ্গে যুক্ত।

এখন **দুর্বার ভাবনা** পাওয়া যাচ্ছে

শিলিগুড়িতে বুকস, কুচবিহারে পার্থ লাহিড়ী, এন এইচ রোড, নবদ্বীপের পোড়ামাতলায় সুজয়া প্রকাশনী, পশ্চিম মেদিনীপুরের ভূর্জপত্র (বিদ্যাসাগর ইউনিভার্সিটি রোড), শান্তিনিকেতনে সুবর্ণরেখা।

কলকাতায়

হাওড়া স্টেশন (কলকাতা বাসস্ট্যান্ড, হাওড়া বাসস্ট্যান্ড), শিয়ালদহ স্টেশন (সানশাইন বুকস্টল, রামকৃষ্ণ পুস্তকালয় ও অন্যত্র), কলেজ স্ট্রিট (পাতিরাম, বুকমার্ক, মণীষা গ্রন্থালয়, বইচিত্র ও অন্যত্র)।

রাসবিহারী মোড়, ফুলবাগান (বেলেঘাটা), হাতিবাগান, শ্যামবাজার (পাঁচমাথার মোড়), ঢাকুরিয়া (দক্ষিণাপণের বিপরীতে), বইকল্প (দোতলায়), বিধাননগর (উল্টোডাঙা) স্টেশন ও অন্যত্র।

যাঁরা পত্রিকার এজেন্সি নিতে চান এই ঠিকানায় যোগাযোগ করুন— ১২/৫ নীলমণি মিত্র স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০৬।

অথবা ফোন করুন ০৯৬৭৪ ১৬২০৯৪ অথবা ০৩৩ ২৫৪৩ ৭৫৬০।

রিউম্যাটয়েড আর্থ্রাইটিসের ব্যবসা-বাণিজ্য

রিউম্যাটয়েড আর্থ্রাইটিস গোত্রের অনেক রোগ আছে যেগুলো ঠিক চিকিৎসা না করলে রোগী পঙ্গু হয়ে যায় আর ব্যথায় কাতরায়। কিছু বছর ধরে এর কার্যকর চিকিৎসা চলছে— এই ওষুধগুলো তেমন দামি নয়, আর রোগের প্রথম অবস্থায় এই সব ওষুধের প্রয়োগ ঘটালে রোগ থমকে দাঁড়ায়।

কিন্তু অনেক রোগী পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়ার জন্য এই সব ওষুধ নিতে পারেন না; আর কিছু রোগীর এ সব ওষুধে ভালো কাজ হয় না। তাদের চিকিৎসায় লাগে নতুন গোত্রের ওষুধ বায়োলজিকস্। কিন্তু আকাশছোঁয়া দাম এই বায়োলজিকস্-এর— লিখছেন **ডা. আশীষ কুমার কুন্ডু।**

রোগভোগের সাম্রাজ্যে রিউম্যাটয়েড আর্থ্রাইটিস নিজেই একটা ছোটখাটো জগৎ। এই জগতে রিউম্যাটয়েড আর্থ্রাইটিস ছাড়াও আরও কতগুলো রোগ আছে। যেমন অ্যাংকালইজিং স্পন্ডিলাইটিস, সেরোনেগোটিভ স্পন্ডাইলো- আর্থ্রোপ্যাথি, জুভেনাইল ইডিওপ্যাথিক আর্থ্রাইটিস, সোরিয়াটিক আর্থ্রোপ্যাথি ইত্যাদি। এই সব রোগের মধ্যে বেশ কিছু মিল আছে। তবে সব চেয়ে বেশি মিল এদের চিকিৎসায়। একই ধরনের ওষুধ এই রোগগুলোয় কাজ করে। এদের বলা হয় ডিএমআরডি (DMRD— Disease Modifying anti Rhematoid Drugs) আমাদের দেশে এই রোগগুলোর প্রকোপ দিন দিন বেড়েই চলেছে, কারণ জানা নেই।

প্রবীণ জয়সোয়াল, বছর ২৪-২৫, চার পুরুষ ধরে কলকাতার বাসিন্দা। বড়বাজারে দোকান, বাবা নেই। মা, দাদা-বৌদি আর তাদের দুই সন্তান নিয়ে বিবেকানন্দ রোডে একটা ছোট্ট বাড়িতে বসবাস। মোটামুটি স্বচ্ছল অবস্থা। প্রবীণও আগে দোকানে বসত। এখন পারতপক্ষে বসে না। বেশিক্ষণ বসেই থাকতে পারে না। ওর অ্যাংকাইলইজিং স্পন্ডিলাইটিস আছে, ডাক্তার দেখিয়ে দেখিয়ে হয়রান। হোমিওপ্যাথি কবিরাজি কিছু বাদ নেই। শেষ পর্যন্ত আমার পাল্লায় পড়ল।

গত তিন দশক ধরে রিউম্যাটয়েড আর্থ্রাইটিস গ্রুপের অসুখগুলো সাধারণত যে ওষুধ দিয়ে চিকিৎসা করা হয় (অর্থাৎ DMRDs) সেগুলো হল মেথোট্রেক্সেট, স্যালাজোপাইরিন, লেফ্লুনামাইড আর হাইড্রক্সিক্লোরোকুইন।

অনেক রোগীই এই সব ওষুধে নিরাময় হয়। তবে সারা জীবন ওষুধ খেয়ে যেতে হয়। মুশকিল হল, অনেক রোগীর আবার এই ওষুধগুলো সহ্য হয় না। আবার বেশ কিছু রোগীর এই ওষুধগুলোয় একেবারেই কাজ হয় না বা সামান্য কাজ হয়।

প্রবীণেরও এই ওষুধে মোটেই ভালো কাজ হল না। হিপ জয়েন্টগুলো নষ্ট হতে থাকল। হাঁটা-চলা বেশ দুরূহ ব্যাপার ওর কাছে।

অতঃ কিম? প্রবীণকে বললাম বাজারে নতুন দামি দামি ওষুধ এসেছে। যেমন ইনফ্লিক্সিমাব। খুব ভালো কাজ করে। পারবে কিনতে? প্রবীণের মা জিজ্ঞাসা করল, কত দাম? লজ্জা পাচ্ছিলাম উত্তর দিতে। তাও বললাম— প্রথম দেড় মাসে তিন লাখ টাকা। তারপর মাসে মাসে হাজার পঞ্চাশেক।

ওরা আকাশ থেকে পড়ল। পরিষ্কার জানিয়ে দিল, এটা ওদের পক্ষে সম্ভব না। মনে মনে ভাবছিলাম, আমার নিজের ওই রোগ হলে আমি নিজেও এই ওষুধ ব্যবহার করতে পারতাম না।

প্রবীণ আর তার মা আমার কাছে ঘোরাঘুরি করে। প্রবীণের দাদা নাকি ভাই-এর রোগ নিয়ে তিতিবিরক্ত। ওদের মা যতদিন বেঁচে আছেন, একরকম চলবে তারপর?

খানিকটা অসহায় হয়েই প্রবীণকে কলকাতার এক সরকারি হাসপাতালে একজন নামী রিউম্যাটলজিস্ট-এর কাছে পাঠালাম। তিনি ওকে কয়েকবার দেখে জানিয়ে দিলেন, ওই দামি ওষুধগুলো (ইনফ্লিক্সিমার জাতীয় ওষুধ) না দিলে কিছু করা যাবে না। তিনি নিরুপায়।

> প্রথম দেড় মাসে তিন লাখ টাকা। তারপর মাসে মাসে হাজার পঞ্চাশেক।

গত এক দশক হল রিউম্যাটয়েড গ্রুপের রোগগুলোর জন্য কিছু দামি ওষুধ বাজারে এসেছে। এদের বলা হয় 'বায়লজিকস্'। আমাদের দেশে এমন পাঁচটা বায়লজিক পাওয়া যায়, বিদেশে আরও বেশি।

ভারতে বেশি ব্যবহৃত বায়লজিক ওষুধ —

জেনেরিক নাম	ব্র্যান্ডের নাম	দাম	একটা ডোজ ৬০ কেজি প্রাপ্তবয়স্কের জন্য	রোগ নিরাময়ের প্রাথমিক খরচ (টাকা)
১.ইনফ্লিক্সিমাব	রেমিকেড	১০০ মিলিগ্রাম ভায়ালের দাম ৩২০০০ টাকা	২০০-৩০০ মিলি ৪-৬ সপ্তাহ	৩-৪ ডোজ ২২-২০ সপ্তাহে ২.৫-৩ লাখ
২.ইটানারসেপ্ট	এমব্রেল	৫০ মিলিগ্রাম ভায়ালের দাম ২৮০০০ টাকা	৫০ মিলিগ্রাম ইনজেকশন প্রতি সপ্তাহে	১২-১৬ সপ্তাহে ৩-৪ লাখ
৩.রিটুক্সিমাব	ম্যাবথেরা	২০০ মিলিগ্রাম ভায়ালের দাম ১৫০০০ টাকা	৪৪০ মিলিগ্রাম মাসে মাসে	৪-৬টা ডোজ ৪-৬ মাসে ১-১.৫ লাখ

এই ওষুধগুলো কিছু মাল্টিন্যাশনাল ড্রাগ কোম্পানির রিসার্চ প্রোডাক্ট। কোম্পানিগুলো পেটেন্ট করিয়ে নিয়েছে। যতদিনের পেটেন্ট (সাধারণত ২০ বছরের— এক-এক দেশে এক রকম) ততদিন অন্য কোনো কোম্পানি এই ওষুধ তৈরি করতে পারবে না। দামও নির্ধারণ করবে কোম্পানি তার ইচ্ছেমতো।

যেমন ধরা যাক, ইটানারসেপ্ট-এর (এমব্রেল নামে বিক্রি হয়) পেটেন্ট আমেরিকার ২০১২-র অক্টোবর মাসে শেষ হয়ে যাওয়ার কথা ছিল— কিন্তু তা ২০১৮-এর ২২ নভেম্বর পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে (হ্যাঁ পেটেন্টের মেয়াদ বাড়ানো যায় বিভিন্ন ভাবে— এমনকী, শুধুমাত্র ওষুধ-এর রং এবং আকৃতি পালটেও)। ইউরোপে এমব্রেলের পেটেন্টের মেয়াদ আপাতত ২০১৫-র ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। এতদিন পর্যন্ত এই ওষুধের দাম কমার কোনো আশা নেই।

> এত কার্যকর ওষুধ আমরা অধিকাংশ রোগীর ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে পারব না। শুধু দরিদ্র নয়, মধ্যবিত্ত মানুষেরও ধরা ছোঁয়ার বাইরে।

এই ওষুধগুলো কিছু ব্যবহার করার সুযোগ আমার হয়েছে ইএসআই হাসপাতালে। ওখানে রোগীদের ওষুধের দাম দিতে হয় না। আমার যে সব রোগীরা রেলে কাজ করেন, তাঁরাও এই ওষুধ বিনা পয়সায় পান। অবশ্যই একটু দৌড়ঝাঁপ করতে হয়, কাঠখড় পোড়াতে হয়।

যাদের ক্ষেত্রে সাধারণ ডিএমআরডি কাজ করে না, সেখানেও এই বায়লজিকস সাধারণত খুবই ভালো কাজ করে (অবশ্য এরও কিছু পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া আছে)। কিছু রোগের ক্ষেত্রে প্রথমেই সাধারণ ডিএমআরডি না দিয়ে এই সব বায়লজিকস দেওয়াই বেশি যুক্তিসঙ্গত। বলা যায় বায়লজিকস অনেক রিউম্যাটয়েড গ্রুপের রোগীদের নতুন জীবন দিয়েছে।

এত কার্যকর ওষুধ আমরা অধিকাংশ রোগীর ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে পারব না। শুধু দরিদ্র নয়, মধ্যবিত্ত মানুষেরও ধরাছোঁয়ার বাইরে। সরকারি হাসপাতালে দরিদ্র রোগীদের বিনা পয়সায় সরবরাহ করার চিন্তাটা বোধহয় স্বপ্নেও করা যায় না।

পেটেন্ট আইন সুসংবদ্ধ ভাবে চালু হয় আমেরিকায় ১৯৮৪ সালে। (হ্যাচ-ওয়াক্সম্যান অ্যাক্ট ১৯৮৪)। এর মানে হল একটা নতুন ওষুধ যে কোম্পানি বাজারে ছাড়বে, সেই কোম্পানির পেটেন্টের মেয়াদে অন্য কোনো কোম্পানি এই ওষুধ তৈরি বা বিক্রি করতে পারবে না। ওষুধের দাম নির্ধারণ করবে সেই কোম্পানি। সাধারণত পেটেন্টের মেয়াদ ২০ বছর। পৃথিবীতে বিভিন্ন পেটেন্ট চালু আছে। আমেরিকার একটা, ইউরোপের একটা, কানাডার একটা। তাদের নিজেদের মধ্যে সমঝোতার জন্য সম্মিলিত একটা পেটেন্ট ট্রিটি (চুক্তি)ও আছে।

মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিগুলোর বক্তব্য, তারা গবেষণার পেছনে টাকা ঢেলেছে। তাই তাদের লাভের দিকটাও দেখতে হবে। তার মানে কি সাধারণ মানুষ এই সব ওষুধ থেকে বঞ্চিত হবে? সমস্যাটা শুধু রিউম্যাটয়েড গ্রুপের ওষুধের নয়। জীবনদায়ী ক্যানসারের ওষুধ, এডস্-এর ওষুধ নিয়েও একই সমস্যা। ভারত ১ জানুয়ারি ২০০৫-এ ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশনের Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) Agreement সই করে যার ফলে ভারত এখন বড়ো মাল্টিন্যাশনাল ওষুধ

কোম্পানির ২০ বছরের পেটেন্ট-এর শর্ত মেনে নিচ্ছে।

২৩ মার্চ, ২০১০-এ প্রেসিডেন্ট ওবামা এক নতুন অ্যাক্টে সই করেন (দয়া-পরবশ হয়ে), তিনি নিয়ম করেন ২০ বছর নয়, ১২ বছর পরেই অন্য কোম্পানিগুলো জেনেরিক ওষুধ তৈরি করতে পারবে (বায়োলজিক ওষুধের ক্ষেত্রে)। এই নতুন আইনের নাম হচ্ছে Patient Protection and Affordable Care Act (হাঃ হাঃ! প্রবীণ, তোমাকে আর ২০ বছর অপেক্ষা করতে হবে না। ১২ বছর অপেক্ষা করলেই হবে।)

গরিব দেশগুলো কি এই পেটেন্ট বিক্রি অগ্রাহ্য করতে বা ভাঙতে পারে না? পারে।

গরিব দেশগুলো কি এই পেটেন্ট বিক্রি অগ্রাহ্য করতে বা ভাঙতে পারে না? পারে।

১৯৯৭ সালে পেটেন্ট আইন ভাঙার চেষ্টা করে দক্ষিণ আফ্রিকা। একটা আইন পাশ করে যাতে ওই দেশের ওষুধ কোম্পানিগুলো একই ওষুধ সস্তায় তৈরি বা আমদানি করতে পারে (সেই দেশ থেকে যেখানে পেটেন্ট আইন বলবৎ নেই)।

২০০৭ সালে থাইল্যান্ড দেশীয় কোম্পানিদের বাধ্যতামূলক লাইসেন্স প্রদান করে, 'অ্যাবট' (Abbott) কোম্পানির 'ক্যালেট্রা-র (এডস-এর ওষুধ) পেটেন্টকে অগ্রাহ্য করে। একই ভাবে হার্টের রোগের ওষুধ প্ল্যানিক্স (স্যানোফি আভেন্টিস আর ব্রিস্টল মেয়ার স্কুইব-এর পেটেন্ট করা ওষুধ)-এর পেটেন্ট লঙ্ঘন করে।

২০০৭ সালেই ব্রাজিলের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ডা. সিলভা দেশীয় কোম্পানিদের বাধ্যতামূলক লাইসেন্স প্রদান করেন, যাতে মার্ক কোম্পানির এডস-এর ওষুধ ইটাভিরেজ দেশেই তৈরি করা যায় এবং অনেক সস্তায় বিক্রি করা যায়— মার্ক কোম্পানির পেটেন্ট অগ্রাহ্য করে।

২০১৩ সালে আমাদের সরকারও সিদ্ধান্ত নেয় যে, 'বেয়ার' কোম্পানির ক্যানসারের ওষুধ 'নেক্সাভার'-এর পেটেন্ট লঙ্ঘন করা হবে। 'ন্যাটকো' নামে এক ভারতীয় কোম্পানিকে দায়িত্ব দেওয়া হয় এই ওষুধ তৈরি করতে। এই সিদ্ধান্ত আশা জাগিয়েছে যে, এই ওষুধ সস্তায় পেলে অনেক ক্যানসারের রোগী লাভবান হবেন।

স্বভাবতই আমেরিকা এই সিদ্ধান্ত ভালো চোখে দেখেনি। স্বয়ং প্রেসিডেন্ট ওবামা তার অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। এও শোনা যাচ্ছে যে, পেটেন্ট ভাঙার এই ধারা চালু থাকলে ভারতের বাণিজ্যের ওপর 'ট্রেড স্যাংশন' চালু হতে পারে।

ভারত কি রিউম্যাটয়েড গ্রুপের অসুখের বায়লজিক ওষুধগুলোর ক্ষেত্রে পেটেন্ট ভাঙবে? লোকসভায় বিপুল ভাবে জিতে আসা বিজেপি সরকারের কি ক্ষমতা আছে আমেরিকার চোখ রাঙানিকে অগ্রাহ্য করার?

প্রবীণ জয়সোয়ালের কী হবে? আমরা ডাক্তাররা কি ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে বসে থাকব, যতদিন না ওষুধ কোম্পানিগুলোর পেটেন্ট শেষ হবে?

লেখক পরিচিতি : ডা. আশীষ কুমার কুণ্ডু, এমবিবিএস, ডিসিএইচ, এমডি, ফিজিক্যাল মেডিসিন ও পুর্নবাসন বিশেষজ্ঞ। প্রাইভেট প্র্যাকটিস করেন। শ্রমজীবী মানুষের জন্য তৈরি হাওড়ার একটা ক্লিনিকেও চিকিৎসা করেন।

With Best Compliment
from

A. N. Pharmacia Laboratories Pvt. Ltd.

Celebrating 30 Years

Recognised Nationally And Internationally

জিন-এর 'সম্ভাবনা' এবং অ-'সম্ভাবনা' : আজকের সময়ের এক পুনর্মূল্যায়ন

প র্ব : দু ই

জিন থেরাপি থেকে ডিজাইনার বেবি

বিজ্ঞান, কল্পকথা ও সমাজ-রাজনীতির ইতিবৃত্ত

জিন। ডাক্তারবাবু যখন গম্ভীর মুখে বলেন, বংশগত রোগ, জেনেটিক রোগ, আমরা হাল ছেড়েই দিই। এ রোগ ভালে হবে না তো পুরোপুরি। আজকাল অবশ্য উল্টো কথা শোনা যাচ্ছে— আরে জেনেটিক রোগ তো কী হয়েছে, জিন থেরাপি আছে না? যারা একটু বেশি খবর রাখেন, তাঁরা বলছেন, আর ক'টা দিন সবুর কর, ডিজাইনার বেবি পাওয়া যাবে। সেটা আবার কী? আরে, কুমোরটুলিতে অর্ডার দিয়ে ঠাকুর গড়ানোর মতো, চাইলে কার্তিকের মতো বাচ্চা পাওয়া যাবে। বাচ্চাও অর্ডারি মাল হয়ে উঠছে না কি? কিন্তু এর কতটা সম্ভব আর কতটা উচিত? শক্তিশালী এই প্রযুক্তি আবার পরমাণু বোমার মতোই কোনো নতুন বিপদের মুখে ঠেলে দেবে না তো? ধনী তার জাগতিক সম্পদের অধিকারকে বিস্তৃত করবে না তো শ্রেষ্ঠ শরীর ও বুদ্ধির অধিকারে? জিন নিয়ে, জাতি নিয়ে, মানুষের জন্মগত গুণ ও দোষ নিয়ে, যে সব গল্পকথা, অতিকথা তৈরি হয়েছে সেগুলো বিজ্ঞান না কি রাজনীতি? জিনগত রোগের হাত ধরে সেই সব মৌলিক প্রশ্নের দরজায় পৌঁছে দিচ্ছেন **ডা. সুমিত্রন বসু।**

[আগের সংখ্যায় যা পড়েছি : জিনগত রোগ মানেই বংশগত রোগ, কিংবা শরীরে নতুন জিন বিকৃতি (মিউটেশন)-এর ফলে উৎপন্ন রোগ। জেনেটিক নানা রোগ আছে, যেগুলো মানব-প্রজাতির সুদীর্ঘ ইতিহাসে এক সময় মানুষের বেঁচে থাকার সহায়ক হয়ে উঠেছিল; এমনই একটা রোগ হল সিকল সেল অ্যানিমিয়া। আবার আজ যা ডায়াবেটিসের জেনেটিক প্রবণতা, আদিম মানুষকে তা খিদের সময় বাঁচিয়ে রেখেছিল। তাই জিন নিয়ে কোনও সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন করার আগে ভাবা দরকার, প্রায় কোনও সহজ প্রাপ্য জিনই আলাদা করে ভাল নয়, খারাপও নয়; সেগুলো একটা বিশেষ পরিবেশের সাপেক্ষে ভাল বা খারাপ— এই মাত্র।]

ডলি মারা গেছে ২০০৩ সালে। তাকে এই এগারো বছরে আমরা খানিক ভুলেছি বটে, কিন্তু সে যে সব কল্পবিজ্ঞান-সুলভ অতিকথার জন্ম দিয়েছিল তারা টিঁকে আছে। আর কী আশ্চর্য সমাপতন! ওই ২০০৩ সালেই আমাদের জিনরহস্য নাকি উন্মোচিত হয়ে গেছে, অন্তত 'হিউম্যান জিনোম প্রজেক্ট'-এর সফল পরিসমাপ্তি ঘটেছে! খবরের কাগজ পড়া গড়পড়তা বাঙালি ধারণা করেছিলেন, এই প্রজেক্টের সফলতা মানে মানব-জিন রহস্যের চাবিকাঠি হাতের গোড়ায়, খুব শিগগিরই আমরা সমস্ত জিনগত রোগের স্থায়ী সমাধান করে ফেলব। হয়তো বা অর্ডার দিয়ে নির্দিষ্ট জিন-ওয়ালা মানুষ বানানো যাবে সুকুমার রায়ের হাঁসজারু ও বকচ্ছপদেরও নির্ঘাত চিড়িয়াখানায় দেখতে পাব কিন্তু সে রকম হয়নি। তাই

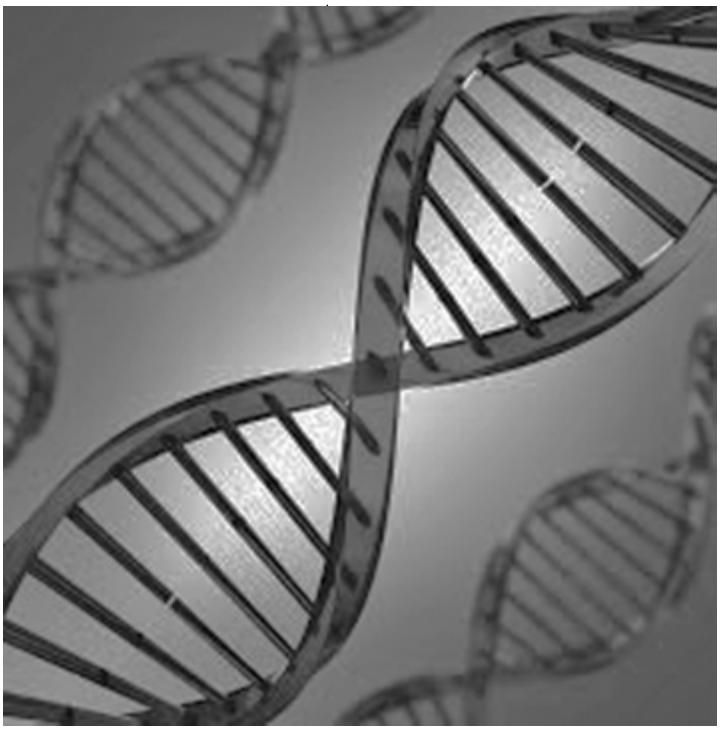

বলে কি কিছুই হয়নি! না, তা-ও বলা যাবে না। কী কী হয়েছে, কতটুকু হয়েছে, আর হয়ে কার কী লাভ, কার কী ক্ষতি— সে নিয়ে চর্চা বাংলা ভাষায় সে ভাবে হয়নি। আমরা সেই ব্যাপারটা এখানে দেখার চেষ্টা করব।

ওহো, গোড়াতেই ডলির পরিচয় করিয়ে দেওয়া উচিত ছিল। সেই ১৯৯৬ সালে ইয়ান উইলমুট-রা স্কটল্যান্ডের এক ল্যাবরেটরিতে বানিয়ে ফেললেন এক আজব ভেড়া, যে কিনা তার নিজের মায়ের হুবহু যমজ বোন। আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনি ঠিকই পড়েছেন, কথাখান 'মায়ের যমজ বোন'-ই বটে। নিজের মায়ের বোন হয়ে ওঠার কথা বোধকরি আমাদের পুরাণে

অজস্র অভাবনীয় সম্পর্কের মধ্যেও নেই। কিন্তু ডলির জন্মবৃত্তান্ত ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির গল্পকেও হার মানাবে যে! একটা ভেড়ার দেহ থেকে একটা কোষ তুলে নিয়ে ইয়ান উইলমুট আর তাঁর দলবল সেটা থেকে সব জিন নিয়ে নিলেন। তারপর সে সব জিন (আদতে জিন-সমেত কোষ-নিউক্লিয়াস) আর একটা ভেড়ার কোষের মধ্যে ঢুকিয়ে, সেই একটা মাত্র কোষকে অন্য এক ভেড়ার গর্ভে স্থাপন করলেন। সেই কোষ ক্রমে বিভাজিত হয়ে বহু সংখ্যক কোষের জন্ম দিল, আর তাই থেকে গড়ে উঠল ডলি। যে ভেড়ার গর্ভে ডলি বেড়ে উঠল সেই ভেড়া কিন্তু ডলির মা নয়, যে ভেড়ার কোষের মধ্যে জিন ঢুকিয়ে ডলিকে তৈরি করা হল, সে ভেড়াও কিন্তু ডলির মা নয়। ডলির মা হল সেই ভেড়াটাই যার কোষ-নিউক্লিয়াস তথা জিনগুলোকে নিয়ে ডলিকে তৈরি করা হল। এবং সেই মা ভেড়া ডলির যমজ বোনও বটে।

> ১৯৯৬ সালে ইয়ান উইলমুট-রা স্কটল্যান্ডের এক ল্যাবরেটরিতে বানিয়ে ফেললেন এক আজব ভেড়া, যে কিনা তার নিজের মায়ের হুবহু যমজ বোন।

কেন বলুন তো? গর্ভদাতা 'মা' কেবল ডলিকে নিজের দেহের মধ্যে রেখে খাইয়েছে বাড়িয়েছে, তার কোনো বৈশিষ্ট্য ডলির মধ্যে সঞ্চারিত হয়নি। কোষদাতা মা-ও অনেকটা তাই, তার কোষের মধ্যে ডলির জিনগুলো প্রতিপালিত হয়েছে, কিন্তু কোষের প্রায় কোনো বৈশিষ্ট্যই তার মধ্যে চলে আসেনি। কেবলমাত্র যে ভেড়াটার কোষ-নিউক্লিয়াস তথা জিনগুলোকে নিয়ে ডলিকে তৈরি করা হল, সে-ই পেরেছে নিজের বৈশিষ্ট্যগুলো ডলির মধ্যে সঞ্চারিত করে দিতে। সুতরাং সেই ডলির মা। লক্ষ্য করুন, ডলির কোনো বাবা নেই কিন্তু, থাকা সম্ভবই নয়। সাধারণ জন্ম প্রক্রিয়ায় মা আর বাবা দু'জনের কাছ থেকে একটা করে জননকোষ (মা-র কাছ থেকে ডিম্বাণু আর বাবা-র কাছ থেকে শুক্রাণু) আসে, তারা মিলিত হয়, তাদের জিনগুলো এক সঙ্গে আসে, তারপর সৃষ্টি হয় একটা মাত্র কোষ-জাইগোট (zygote)। জাইগোট থেকে বারংবার বিভাজনের ফলে সৃষ্টি হয় ভ্রূণ এবং ভ্রূণ থেকে তৈরি হয় পূর্ণাঙ্গ বাচ্চা। ডলির ক্ষেত্রে সব জিন-ই এসেছিল একটা মাত্র মেয়ে-ভেড়ার কাছ থেকে, সুতরাং তার বাবা নেই।[১]

একটা জাইগোট যদি মায়ের গর্ভে দু'টো আলাদা টুকরো হয়ে যায় এবং দু'টো টুকরোর প্রতিটা থেকেই এক-একটা বাচ্চার জন্ম হয়, তবে তারা হবে হুবহু যমজ, ভালো বাংলায় অনেক সময় বলে সদৃশ যমজ। টুকরো দু'টো যদি পুরো আলাদা না হয় তা হলে তৈরি হয় জোড়া-লাগা বাচ্চা, তাদের অনেক সময় অপারেশন করেও আলাদা করা যায় না। ইরানের লাদান বিজানি আর লালে বিজানি ছিলেন মাথায়-মাথায় জোড়া-লাগা সদৃশ যমজ। এই সেদিন, ২০০৩ সালে ২৯ বছর বয়সে, তাঁরা আলাদা করার অপারেশন করালেন জার্মানিতে, কিন্তু অত্যাধুনিক প্রযুক্তি সত্ত্বেও মারা গেলেন দু'জনেই। কিন্তু কথাটা এই যে, হুবহু যমজ বাচ্চা, তা সে জোড়া-লাগা হোক আর আলাদা হোক, তাদের জিন একেবারে এক রকম। ডলি যেহেতু সব জিন পেয়েছিল তার মা'র কাছ থেকেই, তাই তার জিন মায়ের জিনের সঙ্গে একদম এক রকম ছিল। সে অর্থে সে ছিল তার মায়ের 'হুবহু যমজ' বোন। অবশ্য স্তন্যপায়ী প্রাণীদের ক্ষেত্রে এমন ঘটনা প্রাকৃতিক ভাবে না ঘটলেও, জীবজগতে এমন ঘটনা হরবখত ঘটছে। আপনার সাধের পেয়ারা গাছটার ডাল আপনি দিলেন বন্ধুকে, তিনি সেই ডালটি তাঁর বাড়িতে পুঁতলেন, আর দু'বছর পরে আপনাকে উপহার দিলেন একটা পেয়ারা; আপনি খেয়ে দেখলেন ঠিক যেন আপনারই সাধের গাছের পেয়ারা। হবেই তো, বন্ধুর গাছটা আর আপনার বাড়ির পেয়ারা গাছের জিনসমূহ একেবারে এক। অবশ্য সার, জল এসবেও স্বাদ খানিক বদলাতে পারত, কিন্তু ধরে নিচ্ছি গাছ নেওয়ার সময় বন্ধুবর গাছের যত্ন আপনার কাছ থেকেই জেনে নিয়েছিলেন— সুতরাং স্বাদ, আকার, গন্ধ সবই এক রকম। এই রকম একই জিনসমূহ আছে এমন দু'টো জীবের একটাকে অন্যটার 'ক্লোন' (Clone) বলে। দুঃখিত, কোনো চালু যথাযথ বাংলা

প্রতিশব্দ নেই, যেমন নেই 'জিন' বা 'জাইগোট' এই দু'টো শব্দেরও। সুতরাং শব্দগুলো বাংলাভাষায় ঢুকিয়ে নেওয়াই ভালো।

জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং, জিন থেরাপি এবং তার অসীম সম্ভাবনা এবং একই সঙ্গে জানা-অজানা আশঙ্কা— এই সব বিষয় নিয়ে গত দু'দশক ধরে মিডিয়ায়, কল্পবিজ্ঞানের গল্প ও সিনেমায় এত বিবিধ আলোচনা হয়েছে এবং হচ্ছে, যে এর মধ্যে কতখানি বাস্তব এবং কতখানি অমূলক সেটা একটু স্পষ্ট ভাবে বুঝতে চাইলে, একটু গোড়া থেকে প্রশ্নোত্তরের আকারে আরম্ভ করলেই বোধহয় ভালো হয়।

১. প্রায় এই রকম ব্যাপারটা মানবদেহে 'সারোগেসি' বা 'গর্ভদানকারী মাতা'-র ক্ষেত্রে খানিকটা করা হয় বটে, তবে সেখানে দেহকোষ নেওয়া হয় না। ডিম্বাণু আর শুক্রাণুর মিলনে জন্ম নেওয়া 'জাইগোট' তৈরি করে 'অন্য মা'-এর গর্ভে তাকে প্রতিস্থাপন করা হয়। পাঠকরা ডা. কাঞ্চন মুখার্জি-র 'সারোগেসি' নিয়ে প্রবন্ধ পড়ে দেখতে পারেন। *স্বাস্থ্যের বৃত্তে*-র জুন-জুলাই ২০১৪ ও আগস্ট-সেপ্টেম্বর ২০১৪-য় এ বিষয়ে একটি প্রবন্ধ ছাপা হয়েছে।

এর ফলে পাঠক কিছু পরিভাষাগত সমস্যার মুখোমুখি হতে পারেন, কিন্তু এর চেয়ে কার্যকর কোনো উপায় হয়তো আর নেই।

জিন কী?

একটা প্রাণীর শরীরের প্রায় প্রত্যেকটা কোষের ভেতরে যে 'নিউক্লিয়াস' (Nucleus) রয়েছে, তার অভ্যন্তরে থাকে একাধিক 'ক্রোমোজোম' (Chromosome)-এর জোড়া। এই প্রতিটা জোড়ার মধ্যে একটা মাতার কাছ থেকে এবং আরেকটা পিতার কাছ থেকে প্রাপ্ত। এক একটা প্রজাতির প্রতিটা সদস্যের এই ক্রোমোজোম জোড়ার সংখ্যা একেবারে নির্দিষ্ট এবং সাধারণ ভাবে এই সংখ্যার কোনোরকম নড়চড় ঘটে না— যেমন মানুষের রয়েছে ২৩ জোড়া, আবার গোরুর ৩০ জোড়া ক্রোমোজোম। এই ক্রোমোজোমগুলো আসলে বারংবার কুণ্ডলী পাকানো, সরু এবং অতীব দীর্ঘ তন্তুর মতো দেখতে একটা বৃহৎ জৈব-অণু, ডিএনএ (DNA)-অণু। বড়ো বড়ো উলের দোকানে উল কুণ্ডলী পাকিয়ে রাখা হয়, সেই কুণ্ডলীকে আবার কুণ্ডলী পাকানো হয়, সেটাও আবার কুণ্ডলী পাকানো থাকে— ক্রোমোজোমে ডিএনএ-র বিরাট লম্বা অণুটা অনেকটা ওই ভাবে কুণ্ডলী পাকানো থাকে, কিন্তু এ ক্ষেত্রে কুণ্ডলী আরও অনেক বেশিবার পাকানো হয়।

> একটা ডিএনএ-তে যে নির্দিষ্ট ক্রম অনুযায়ী তিনটে 'বেস-যুগল' পরপর অবস্থান করে, নানা ধাপ পেরিয়ে সেই ক্রম অনুযায়ী একটা নির্দিষ্ট 'অ্যামিনো অ্যাসিড' (Amino Acid) গঠিত হয়।

'ডিএনএ' ব্যাপারটা কী? 'ডিএনএ' (DNA) পুরো কথাটা হল 'ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিক অ্যাসিড' (Deoxyribonucleic Acid)। আমরা যদি কোনো ভাবে একটা ডিএনএ অণুর কুণ্ডলী বহু কষ্টে ছাড়িয়ে তাকে সোজা করে ধরতে পারি তা হলে দেখব যে এই লম্বা 'সুতো'টা আসলে দেখতে আদপে ঠিক যেন একটা দড়ির মই, যার দু'দিকের দু'টো সমান্তরাল 'দড়ি (Strand)' নির্দিষ্ট দূরত্ব অন্তর নিয়মিত ভাবে একে অন্যের ওপর পাক খেয়ে চলেছে। ওই মই-এর দু'দিকের 'রেলিং-দড়ি'-র একটা অংশ হল বিশেষ এক শর্করা (ডি-অক্সিরাইবোজ) ও ফসফেট মূলক দিয়ে তৈরি— সেগুলো সব এক রকম। তাদের চেহারা বা কাজ নিয়ে আমাদের আপাতত মাথা না ঘামালেও চলবে।

- 'জিন হল জীবকোষে 'ডিএনএ' অণুর একটা লম্বা খণ্ড, যা থেকে সাধারণত নানা ধাপ পেরিয়ে একটা প্রোটিন তৈরি হয়।
- জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এর সাহায্যে অনেক অভাবনীয় কাজ সম্ভব।
- ব্যাকটিরিয়া থেকে মানুষ—সব জীবের জিন-এ রয়েছে A,T,C,G, এই চারটে 'বেস', পাশাপাশি দুটো 'বেস' থাকে বলে বলা হয় 'বেস যুগল'।
- এই 'বেস যুগল' যে নির্দিষ্ট ক্রম অনুসারে জিন-এ সাজানো থাকে, জিন-নির্দেশিত প্রোটিন সেই রকম হয়।
- মানুষের একটা জিন কৃত্রিম উপায়ে সফল ভাবে অন্য কোনো জীবকোষে ডিএনএ শৃঙ্খলের মধ্যে সংস্থাপন করতে পারলে সেই জীব মানুষের ওই জিন-নির্দেশিত প্রোটিনটাই তৈরি করে।
- একটা জিন-পরিবর্তিত ব্যাকটিরিয়ার কোষে মানুষের হরমোন 'ইনসুলিন' তৈরি করার মানব-জিন ঢুকিয়ে দিয়ে মনুষ্য-ইনসুলিন তৈরি করা সম্ভব হয়েছে।

মাঝখানের পাদানি বা ধাপগুলো প্রতিটা এক এক রকমের বৈশিষ্ট্যযুক্ত, আর তারাই ডিএনএ অণুর মূল কাজটা করে। এখন ডিএনএ অণুর দুই দিকের 'রেলিং-দড়ি'-র মাঝখানের সমস্ত 'পাদানি' বা ধাপগুলোকে ঠিক মাঝ-বরাবর কেটে ফেললে কী দেখব? উপরোক্ত মই-এর দু'দিকের দড়ি দুটো, তাদের গায়ে লেগে থাকা আধখানা ধাপ সমেত, আলাদা হয়ে যাবে। দেখা যাবে যে, এক একটা দড়ির সঙ্গে লেগে থাকা হাজার হাজার ধাপ আসলে নির্দিষ্ট ক্রম অনুসারে পরপর সাজানো কয়েক হাজার ছোট জৈব-অণু বা 'নিউক্লিওটাইড' (Nucleotide) দিয়ে গঠিত। একটা দড়ির নিউক্লিওটাইড আর একটা দড়ির নিউক্লিওটাইড-এর সঙ্গে সংযুক্ত রয়েছে, ওই সংযুক্ত অংশ দিয়েই ওই মই-এর পাদানি বা ধাপ তৈরি। এই পাদানি বা ধাপ চারটি ভিন্ন ধরনের উপাদান বা 'বেস' (Base)-এর মধ্যে দুটোর সংযুক্তি দিয়ে তৈরি হতে পারে। চারটে 'বেস' এর নাম হল অ্যাডিনিন, থাইমিন, সাইটোসিন ও গুয়ানিন। কিন্তু অ্যাতো বড়ো নাম তো সব সময় ব্যবহার করা যায় না, তাই তাদের A, T, C, G এই চার নামে ডাকা হয়। A, T, C, G হল যথাক্রমে অ্যাডিনিন, থাইমিন, সাইটোসিন ও গুয়ানিন— এই চারটে 'বেস'-এর নামের আদ্যক্ষর। 'বেস' জিনিসটা কী সে প্রসঙ্গে এখন যাব না, খালি ধরে নেব, তাদের প্রত্যেকটা অন্যটা থেকে সামান্যই আলাদা— এতটা আলাদা যে নিউক্লিয়াসে যে সব উৎসেচক আছে তারা চার রকমের বেস-এর প্রত্যেকটাকে আলাদা করে চিনতে পারে। কিন্তু এরা আবার অনেকটা এক রকমও বটে, এতটা এক রকম যে ডিএনএ অণুর মধ্যে একটা বেস-এর জায়গায় অন্য একটা বেস দিব্যি বসে পড়তে পারে, অবশ্য একটা নিয়ম মেনে।

নিয়মটা কী? আমরা আগেই দেখেছি, ওই মই-এর দু'দিকের 'রেলিং-দড়ি'-র একটা অংশ হল, বিশেষ এক শর্করা (ডি-অক্সি রাইবোজ) ও ফসফেটমূলক দিয়ে তৈরি— সেগুলো সব এক রকম। কিন্তু রেলিং-দড়ির অন্য অংশ ও তার থেকে বেরিয়ে আসা মই-এর ধাপগুলো, তৈরি A, T, C, G-এর বাড়ানো অংশ দিয়ে। এক দিকের দড়ির A 'হাত' বাড়িয়ে দেয়, আর অন্য দিকের দড়ির T 'হাত' বাড়িয়ে দেয়, A-র বাড়ানো 'হাত' চেপে ধরে T-র বাড়ানো 'হাত'। আর এই A আর T-র দুটো 'হাত' জুড়ে তৈরি হয় মাঝখানে মই-এর ধাপ। কিন্তু কে কার হাত ধরবে সে ব্যাপারে A, T, C, G-দের খানিক দলবাজি আছে। এক দিকের দড়ির C সব সময়ে অন্য দিকের অনুরূপ স্থানে অবস্থিত G-র হাতই ধরবে, কখনও A বা T- এর হাত ধরবে না। সেই রকমই এক দিকের A সব সময়ে অন্য দিকে T-এর হাতই ধরবে, কখনও C বা G-এর হাত ধরবে না। ফলে ধরা যাক, একটা ডিএনএ-এর এক দিকের দড়ির একটা ছোটো খণ্ড ও পাদানি-অর্ধাংশ যদি এরকম হয় : -G-T-C-A-A-T-A, তা হলে আরক দিকের দড়িটার অনুরূপ স্থানে অবস্থিত খণ্ডটা হবে এরকম : -C-A-G-T-T-A-T। ডিএনএ-র একটা দড়ি-পাদানির মধ্যে

অবস্থিত একটা 'বেস'-এর সঙ্গে সংযুক্ত আরেকটা দড়ি-পাদানির অন্য একটা 'বেস'-এই দুটোকে একটা 'বেস-যুগল' (Base-pair), হিসাবে অভিহিত করা হয়। একটা ডিএনএ অণু কয়েক লক্ষ এরকম 'বেস-যুগল' দ্বারা গঠিত।

একটা ডিএনএ-তে যে নির্দিষ্ট ক্রম অনুযায়ী তিনটে 'বেস-যুগল' পরপর অবস্থান করে, নানা ধাপ পেরিয়ে সেই ক্রম অনুযায়ী একটা নির্দিষ্ট 'অ্যামিনো অ্যাসিড' (Amino Acid) গঠিত হয়। অনেক অ্যামিনো অ্যাসিড পরপর সাজিয়ে তৈরি হয় এক-একটা প্রোটিন। এইখানে বলে রাখি, ডিএনএ থেকে প্রোটিন তৈরি হওয়ার প্রক্রিয়াটা কিন্তু একটা মাত্র ধাপে সম্পন্ন হয় না, বরং মধ্যবর্তী পর্যায়ে 'আরএনএ' (RNA) বলে একটা ডিএনএ-এর অনেকটা অনুরূপ অণু তৈরি হয়। এক একটা 'জিন' হল সমগ্র ডিএনএ-র একটা ছোটো অংশ বিশেষ, অর্থাৎ 'বেস-যুগল' এর লম্বা শৃঙ্খল, যা এক একটা প্রোটিন অণুর সংকেত বহন করে। 'জিন'-এর এই সংজ্ঞা অতি সরলীকৃত, কিন্তু এখন এই সরল সংজ্ঞা আমাদের কাজে লাগবে। কয়েকশো থেকে কয়েক হাজার এই রকম সুনির্দিষ্ট বেস-যুগল দ্বারা একটা নির্দিষ্ট 'জিন' গঠিত। জিন-এ বেস-যুগলের সজ্জা ঠিক কেমন, সেই অনুসারে সেই জিনের তৈরি প্রোটিনের গঠন ঠিক হয়। অন্য কথায়, জিন-এর বেস-যুগল কী রকম পরম্পরায় সাজানো আছে, তার ওপর নির্ভর করে জিন-নিয়ন্ত্রিত প্রোটিনের মধ্যে কোন্ অ্যামিনো অ্যাসিড কোথায় বসবে। সুতরাং একটা জিন-এর বেস-যুগল ঠিক কী রকম ভাবে পরপর সাজানো আছে, তার ওপরে নির্ভর করে সেই জিন-দ্বারা গঠিত অ্যামিনো অ্যাসিড-এর শৃঙ্খলের গঠন। এই বিশেষ প্রোটিনটা সাধারণত একটা 'এনজাইম' (Enzyme) হিসেবে শরীরের ভিতরে অসংখ্য যে জৈব-রাসায়নিক ক্রিয়া-বিক্রিয়া প্রতি মুহূর্তে ঘটে চলেছে, তার মধ্যে কোনো একটা নির্দিষ্ট বিক্রিয়া কার্যকর করতে একেবারে মৌলিক ভূমিকা রাখে— যেমন পাকস্থলীর উৎসেচক পেপসিন খাবার হজম করতে অত্যাবশ্যক। এ ছাড়া আছে 'গঠনকারী প্রোটিন' (Structrual proteins), যেমন মাংসপেশির একটা গঠনকারী প্রোটিন হল মায়োসিন। এই সব প্রোটিনের প্রত্যেকটাই নির্মাণ করবার জন্য আমাদের শরীরে আছে যথাযথ একটা জিন।

পৃথিবীর বুকে প্রতিটা ধরনের প্রাণের বংশানুক্রমিক সঙ্কেত বা ডিএনএ-এর মৌলিক উপাদানগুলো আশ্চর্যজনক ভাবে কিন্তু একই — সেই চারখানা নিউক্লিওটাইড, A, T, C, G।

মিউটেশন কী?

কোনো প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম কারণে যদি একটা জিন-এর উপাদান A, T, C, G-দের বিন্যাসের মধ্যে কোনো পরিবর্তনের সৃষ্টি হয়, তাকে বলে 'মিউটেশন' (Mutation)। মিউটেশন ঘটলে তার প্রতিফলন পড়বে সেই জিন থেকে শেষ পর্যন্ত 'অনূদিত' হওয়া প্রোটিন বা এনজাইম-টার মধ্যে। যেমন, ধরা যাক, কোনো জিন-এর একটা বা দুটো বেস-যুগল পরিবর্তিত হল বা বাদ গেল, তখন তার তৈরি করা এনজাইমটা তৈরি হবে না, কিংবা তার অ্যামিনো অ্যাসিড-এর বিন্যাসের মধ্যে কোনো রূপ সামান্য ত্রুটিবিচ্যুতি হবে। এবং এমনকী, যদি শুধু একটা মাত্র অ্যামিনো অ্যাসিড-এর অনভিপ্রেত পরিবর্তন ঘটে যায়, তা হলেই হয়তো এই এনজাইমটা আর শরীরের বিপাকীয় প্রক্রিয়ায় তার জন্য বরাদ্দ নির্দিষ্ট ভূমিকা পালন করতে পারবে না এবং সেই নির্দিষ্ট জৈব-রাসায়নিক বিক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাবে। মানুষের দেহে অভ্যন্তরীণ ভারসাম্য (যাকে আমরা 'Homeostasis' বা 'milieu interior' বলি) নির্ভর করে এই রকম অসংখ্য এনজাইম আর হরমোনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ওপর। ফলে শরীরের কোনো গুরুত্বপূর্ণ একটা বিক্রিয়ায় ভূমিকা রয়েছে, এমন কোনো এনজাইম অকার্যকর হলে গোটা শরীরের ভারসাম্য উল্টেপাল্টে যেতে পারে।

জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং কি?

একটা প্রাণীর নিজস্ব ডিএনএ বা জিনের গঠনকে কৃত্রিম ভাবে এবং প্রত্যক্ষ ভাবে যে কোনো রকম পরিবর্তন করাই হল 'জেনেটিক'-এর সারাংশ। যেমন কোনো প্রাণীর ডিএনএ-র একটা বিশেষ অংশকে সরিয়ে দেওয়া কিংবা তার নিজস্ব ডিএনএ-র মধ্যে অন্য কোনো প্রাণীর ডিএনএ-র বিশেষ অংশ স্থানান্তরিত করা, কিংবা গবেষণাগারে সম্পূর্ণ কৃত্রিম ভাবে গঠন করা একেবারে নতুন কোনো ডিএনএ অন্তর্ভুক্ত করা ইত্যাদি— এ সবই হল একটা বিশেষ উদ্দেশ্যে একটা প্রাণীর ডিএনএ-র কাঠামো বা গঠনকে সুবিধে মতো রূপান্তরিত করা।

নিম্নতর স্তরের কোনো একটা জীব (যেমন এক-কোষযুক্ত ব্যাকটিরিয়া) থেকে উচ্চতর এবং জটিল স্তরের একটা জীব (যেমন মানুষ) এই পৃথিবীর বুকে প্রতিটা ধরনের প্রাণের বংশানুক্রমিক সংকেত বা ডিএনএ-এর মৌলিক উপাদানগুলো আশ্চর্যজনক ভাবে কিন্তু একই — সেই চারখানা নিউক্লিওটাইড, A, T, C, G। এটা সত্যি বিস্ময়কর যে উপযুক্ত পরিবেশের সান্নিধ্যে শুধু এই চারখানা 'অক্ষর'-এর পরম্পরায় বিন্যাসই ঠিক করে দেবে তার চূড়ান্ত অভিব্যক্তি— এমনকী 'জীব'-টা ব্যাকটিরিয়া হবে, না কি মানুষ হবে, সেটাও ঠিক করে তার কোষের নিউক্লিয়াসের এই চারখানা 'অক্ষর'-এর বিন্যাস। আর ঠিক একই কারণে 'জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং' তত্ত্বগত ভাবে একেবারেই অভ্রান্ত। যদি যে কোনো দুটো প্রাণীর ডিএনএ-এর মৌলিক উপাদানগুলো (অর্থাৎ A, T, C, G) একই হয়, তা হলে যুক্তিসম্মত ভাবে একটা প্রাণীর কোনো বিশেষ জিন যদি আরেকটা প্রাণীর ডিএনএ-র মধ্যে কৃত্রিম ভাবে অন্তর্ভুক্ত করা যায়, তা হলে এই জিনটা 'পরদেশী' ডিএনএ-র অভিন্ন অংশ হয়ে উঠবে। সেই জিনটা যদি নতুন প্রাণীটার মধ্যে এসে আগের মতো একই ভাবে সক্রিয়তা বজায় রাখতে পারে, তবে নতুন প্রাণীটার মধ্যে একটা অ-সহজাত বা 'বিদেশি' প্রোটিন সংশ্লেষ হবে। ফলে গবেষণাগারে বাস্তবায়িত হওয়ার অনেক আগে থেকেই জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এর পেছনে যে প্রাথমিক তত্ত্বগত ভিত্তি ছিল তা নিয়ে বিজ্ঞানী থেকে কল্পবিজ্ঞানী— সব মহলেই আলোচনা ও চর্চা শুরু হয়ে যায়।

১৯৭০-এর দশকের আগে কোনো প্রাণীর কোষের ভিতর তার 'জিনোম' (Genome) থেকে একটা নির্দিষ্ট খণ্ড, যার মধ্যে এক বা একাধিক জিন অবস্থান করছে, পৃথক করা এবং তাকে নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা এক প্রকার অসম্ভব ছিল। 'জিনোম' বলতে কোনো জীবের সমস্ত জিন সমূহকে একত্রে বোঝানো হয়ে থাকে। 'রেস্ট্রিকশন এন্ডোনিউক্লিয়েজ (Restriction Endonuclease)' নামক একটা বিশেষ ধরনের এনজাইম ঘটনাচক্রে আবিষ্কার হওয়ার পর এই

পরিস্থিতির বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে। এই জাতের এনজাইমগুলো সাধারণ ভাবে বলতে গেলে 'জিনোম'-এর 'কাঁচি' হিসেবে কাজ করে। তবে অন্যান্য 'এন্ডোনিউক্লিয়েজ'-দের মতো ডিএনএ-এর যত্রতত্র জায়গায় নয়, কোনো একটা ডিএনএ-এর কেবল নির্দিষ্ট কয়েকটা স্থানে 'রেস্ট্রিকশন এন্ডোনিউক্লিয়েজ' তাকে বিভক্ত করে। কোন্ বিশেষ প্রাণীর ডিএনএ-এর ওপর এই এনজাইমটা প্রয়োগ করা হল, তাতে তার কার্যকারিতার হানি হয় না।

ফলে গবেষণাগারে এখন খুব সহজেই সেই ব্যাকটিরিয়ার সংখ্যাবৃদ্ধি করা যায় এবং প্রচুর পরিমাণ ইনসুলিন তৈরি করা যায়।

সে যাই হোক, এই রেস্ট্রিকশন এনজাইমদের ব্যবহার করে মানুষের একটা প্রয়োজনীয় জিন তার ডিএনএ-এর যেই স্থানে রয়েছে, সেই জিন সহ ডিএনএ-এর একটা নির্দিষ্ট খণ্ড আলাদা করা হয়— এই খণ্ডিত ডিএনএ অংশকে বলা হয় 'রেস্ট্রিকশন খণ্ড' (Restriction Fragment)। একই সঙ্গে একটা ব্যাকটিরিয়ার ডিএনএকেও একই রকম ভাবে রেস্ট্রিকশন এনজাইম ব্যবহার করে একটা নির্দিষ্ট জায়গায় বিভাজন করা হয়। তারপর মানুষের ডিএনএ-এর খণ্ডটাকে সেই ব্যাকটিরিয়ার কোষে তার কাটা ডিএনএ-এর দু'টো প্রান্তের মধ্যে ঢুকিয়ে তাদের জুড়ে দেওয়া হয়। এই আঠার কাজটা করে 'ডিএনএ লাইগেজ' (DNA Ligase) বলে আরেক জাতের এনজাইম। এর ফলে মানুষের প্রয়োজনীয় জিন ব্যাকটিরিয়ার ডিএনএ-এর সঙ্গে একীভূত হয়ে যায় এবং সেই ব্যাকটিরিয়া মানুষের প্রয়োজনীয় প্রোটিন সংশ্লেষ করতে আরম্ভ করে। এই নতুন ব্যাকটিরিয়ার ডিএনএ-টিকে বলা হয় 'রিকমবিনেন্ট ডিএনএ' (Recombinant DNA) এবং এই সমগ্র প্রক্রিয়াকে বলা হয় 'রিকমবিনেন্ট ডিএনএ প্রযুক্তি' (Recombinant DNA Technology)। এই ব্যাকটিরিয়া যখন বিভাজিত হয়ে নতুন প্রজন্মের ব্যাকটিরিয়ার জন্ম দেবে, যখন তার ডিএনএ-এর মধ্যে কৃত্রিম ভাবে স্থাপিত মনুষ্য-জিনটাও নতুন প্রজন্মের মধ্যে বাহিত হবে। এই প্রযুক্তির মাধ্যমে যে প্রাণীর প্রকৃতিগত ডিএনএ-কে কৃত্রিম ভাবে পরিবর্তন করা হল, সেই প্রাণীটাকে 'Genetically Modified Organism' ('জিএমও') বা 'Transgenic organism' বলে অভিহিত করা হয়। ১৯৭৩ সালে একটা 'ই. কলি' (E.Coli) প্রজাতির ব্যাকটিরিয়ার ডিএনএ-এর মধ্যে অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধক জিন অন্তর্ভুক্ত করে বিশ্বে প্রথম 'জিএমও' প্রাণী সৃষ্টি হয়; এবং তার পরের বছর একটা ইঁদুরের ভ্রূণকোষের মধ্যে 'বিদেশি' জিন সফল ভাবে ঢোকানো সম্ভব হয়। শুনতে আপাতদৃষ্টিতে খুব সহজ মনে হলেও এই সমগ্র প্রক্রিয়াটা খুবই জটিল। এবং অকৃতকার্যতার হার এখানে খুবই বেশি। ফলে পরীক্ষার শুরুতে অনেকগুলো ডিএনএ নিয়ে আরম্ভ করলে সব শেষে হয়তো একটা সঠিক রিকমবিনেন্ট ডিএনএ তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

এই ভাবে রিকমবিনেন্ট ডিএনএ প্রযুক্তির মাধ্যমে একটা প্রজাতির কোনো বিশেষ জিন আরেকটা প্রজাতির ডিএনএ-র মধ্যে কৃত্রিম ভাবে অন্তর্ভুক্ত করার ফলে কোনো কোনো ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা হল, যেমন চিকিৎসাবিদ্যায়। আগে ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য যে ইনসুলিন প্রয়োজন ছিল তা পাওয়া যেত মৃত মানুষ বা শূকরের অগ্ন্যাশয় থেকে। ফলে তা ছিল খুবই অপ্রতুল এবং খরচসাপেক্ষ, এবং পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াও ছিল বেশি। 'রিকমবিনেন্ট ডিএনএ প্রযুক্তি'-র মাধ্যমে মানুষের দেহে ইনসুলিন তৈরি করার যে জিন রয়েছে সেই জিনটাকে 'ই. কলি' (E.Coli) প্রজাতির ব্যাকটিরিয়ার ডিএনএ-র মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হল। ফলে গবেষণাগারে এখন খুব সহজেই সেই ব্যাকটিরিয়ার সংখ্যাবৃদ্ধি করা যায় এবং প্রচুর পরিমাণ ইনসুলিন তৈরি করা যায়। এর মাধ্যমে পৃথিবীর অসংখ্য ডায়াবেটিস রোগী যেন নতুন করে জীবন লাভ করলেন। আজকে ডায়াবেটিস রোগ এক প্রকার মহামারীর রূপ নিয়েছে— সে জায়গায় যদি এই ইনসুলিন না থাকত তো অবস্থা আরও সঙ্গীন হত। শুধু ইনসুলিন নয়, আরও অন্যান্য হরমোন যেমন গ্রোথ হরমোন, সোমাটোস্টাটিন, হেপাটাইটিস টিকা-সহ বিভিন্ন টিকা তৈরিতেও এখন এই প্রযুক্তি অপরিহার্য। এই সব হাতে গরম ফল ছাড়াও, গবেষণার ক্ষেত্রেও 'রিকমবিনেন্ট ডিএনএ প্রযুক্তি' নতুন দ্বার খুলে দিল। মানুষের দেহে কোনো জিন-এর কী ভূমিকা এবং তা কোথায় কার্যকর বা জিনটা কার্যকর না থাকলে কী হতে পারে, সেই পরীক্ষাগুলো এখন গবেষণাগারে জিএমও ইঁদুরের ওপর করা হয়।

- জেনেটিক (বংশগত) এক-জিনঘটিত রোগে শরীরে একটা জিন ত্রুটিপূর্ণ থাকে; সেই জিন নির্দেশিত প্রোটিন ত্রুটিপূর্ণ হয়— ফলে রোগটা দেখা দেয়।
- 'জিন-থেরাপি'-তে মানুষের কোষেব ভেতরে ত্রুটিপূর্ণ জিন বদলে ত্রুটিযুক্ত জিন বসানো হয়।
- যেমন সিকল সেল অ্যানিমিয়ায় জিন থেরাপি করতে গেলে রোগীর কোষের ১১ নম্বর ক্রোমোজোম জোড়ার একটা নির্দিষ্ট জায়গায় একটা নির্দিষ্ট (ত্রুটিযুক্ত) ডিএনএ খণ্ড বদলে স্বাভাবিক ডিএনএ খণ্ড বসাতে হবে।
- পূর্ণাঙ্গ কোনো মানুষের শরীরে কয়েকটা কোষের জিন বদল করা হলে তাকে বলে 'সোমাটিক জিন থেরাপি'।
- ডিম্বাণু শুক্রাণু মিলনের ফলে উৎপন্ন ভ্রূণকোষে জিন বদল করা হলে তাকে বলে 'জার্মলাইন জিন থেরাপি'— এটা বিতর্কিত ও বহুদেশে আইনত নিষিদ্ধ।

জিন থেরাপি কী?

জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এর প্রযুক্তিগুলো যখন চিকিৎসাবিদ্যায় মানুষের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়, তাকে সাধারণ ভাবে বলা হয় 'জিন থেরাপি' (Gene Therapy)। এই ক্ষেত্রে কোনো মানুষের দেহের ডিএনএ-ই হল 'বিষয়' (subject) যার ওপর অভীষ্ট পরিবর্তন করা হবে। ধরা যাক, কোনো একজন ব্যক্তির শরীরের কয়েকটা বা সকল কোষে ডিএনএ-র মধ্যে এমন একটা জিন রয়েছে, যা কোনো একটা মিউটেশন-এর দরুন ত্রুটিযুক্ত। এই মিউটেশন যদি বংশগত হয় অর্থাৎ জন্মের পূর্বে তার মাতা বা পিতার জননকোষের ডিএনএ-তে ঘটে থাকে, তা হলে এই ত্রুটিপূর্ণ জিন তার শরীরের প্রত্যেকটা

কোষে সমান ভাবে উপস্থিত থাকবে। অথবা, এই মিউটেশন যদি তার জন্মের পর কোনো এক সময়ে কোনো একটা বিশেষ দেহকোষের ডিএনএ-তে আবির্ভূত হয়, তা হলে সেই ত্রুটিপূর্ণ জিন শুধুমাত্র সেই দেহ কোষের বিভাজনের ফলে উৎপন্ন সমস্ত কোষের মধ্যে উপস্থিত থাকবে। এবার এই জিন-সৃষ্ট যে প্রোটিন বা এনজাইম যদি শরীরের বিপাকীয় প্রক্রিয়ায় কোনো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, তা হলে জিনটা ত্রুটিযুক্ত হওয়ার ফলে এনজাইমটা হয় তৈরি হবে, নয় তো একটা নিষ্ক্রিয় বা অকার্যকরী রূপে উৎপাদিত হবে। এর অন্তিম পরিণতি হিসেবে যে রোগটা দেখা দেবে তাকে আমরা জিনঘটিত রোগ বলে অভিহিত করি। এ রকম একটা অসুখ হল 'সিকল সেল অ্যানিমিয়া (Sickle cell anaemia)'। মানুষের প্রতিটা কোষের ১১ নম্বর ক্রোমোজোম জোড়া দুটোতে ডিএনএ-র একটা নির্দিষ্ট স্থানে 'বিটা গ্লোবিন (Beta Globin)' জিন অবস্থিত রয়েছে; এই জিনটার মধ্যে একটা নির্দিষ্ট জায়গায় '-G-A-G-' ক্রমের জায়গায় একটা বিন্দুতে মিউটেশনের ফলে একটা নতুন ক্রম '-G-T-G-' সৃষ্টি হয়। এর ফলে একটা পরিবর্তিত 'বিটা গ্লোবিন' প্রোটিন তৈরি হয়। সেখানে প্রোটিন-শৃঙ্খলে ৬ নম্বর অ্যামিনো অ্যাসিড 'গ্লুটামেট', যা স্বাভাবিক জিন-সংকেত '-G-A-G' দ্বারা সূচিত হত, সেটা থাকবে না। 'গ্লুটামেট'-এর বদলে থাকবে 'ভ্যালিন' বলে অন্য একটা অ্যামিনো অ্যাসিড। ফলে স্বাভাবিক প্রোটিনে গ্লুটামেট ছিল সেই জায়গায় ভ্যালিন-এর সৃষ্টি হয়। কেবল মাত্র এই একটা অ্যামিনো অ্যাসিড-এর পরিবর্তনের ফলে বিটা গ্লোবিনের গঠন ও ব্যবহার অনেকটাই বদলে যাবে, এবং তারই সুদূরপ্রসারী পরিণাম হল সিকেল সেল অ্যানিমিয়া-র মতো মারণ রোগ। এই রোগ নিয়ে অবশ্য *স্বাস্থ্যের বৃত্তে*-র আগের সংখ্যায় (জুন-জুলাই ২০১৪) অনেক আলোচনা করেছি।

জিন থেরাপি হল মানুষের দেহের এক বা একাধিক কোষ থেকে এই ত্রুটিযুক্ত জিন-এর জায়গায় স্বাভাবিক জিন প্রতিস্থাপন করা। এই প্রতিস্থাপন একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের 'আক্রান্ত' কোষগুলোর মধ্যে হতে পারে, সে ক্ষেত্রে একে বলা হয় 'সোমাটিক জিন থেরাপি' (Somatic gene therapy) যা সেই

মানুষটার মধ্যে রোগের উপশম করতে পারে। কিন্তু যেহেতু তার জননকোষের জিন অপরিবর্তিত থেকে যাচ্ছে, তাই তার সন্তানদের মধ্যেও একই ব্যাধির আবির্ভাব হতে পারে। আবার ডিম্বাণু-শুক্রাণু মিলনের পরেই যে ভ্রূণকোষে তৈরি হয়, সেই আদি ভ্রূণকোষের (Zygote) মধ্যে এই জিন প্রতিস্থাপন করা যেতে পারে। তার ফলে এই ভ্রূণকোষটা যখন একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষ হবেন, তখন তাঁর মধ্যে তো নয়ই, এমনকী, তাঁর সন্তানদের মধ্যেও এই অসুখটা আর দেখা দেবে না— একে বলা হয় 'জার্মলাইন জিন থেরাপি' (Germline gene therapy)। সাধারণ ভাবে জিন থেরাপি বলতে আমরা 'সোমাটিক জিন থেরাপি'-কেই বুঝি; 'জার্মলাইন জিন থেরাপি' পদ্ধতিটা খুবই জটিল এবং বিতর্কিত; বহু দেশে এই সংক্রান্ত গবেষণা আইনত নিষিদ্ধ।

'প্রাক-গর্ভাধান জিন-ঘটিত রোগ নির্ণয়' কী?

'কৃত্রিম গর্ভাধান' (In vitro fertilization, বা সংক্ষেপে, IVF) পদ্ধতি প্রাথমিক ভাবে শুরু হয়েছিল অপ্রতিবিধেয় বন্ধ্যাত্বের শেষ অবলম্বনের চিকিৎসা হিসেবে। সংক্ষিপ্ত ভাবে, এই প্রক্রিয়াটাতে একাধিক স্ত্রী-জননকোষ অর্থাৎ ডিম্বাণু মায়ের গর্ভ থেকে কৃত্রিম ভাবে নিষ্কাশন করে নিয়ে একটা অত্যন্ত নিয়ন্ত্রিত আবহাওয়ায় অনেকগুলো পুরুষ-জননকোষ অর্থাৎ শুক্রাণুর সঙ্গে মিলিত করা হয়। এদের মিলন প্রক্রিয়ার ফলে অনেকগুলো 'আদি এবং অবিভক্ত ভ্রূণকোষ' (Zygote) উৎপন্ন হয়। তাদের মধ্যে থেকে কোনো একটা ভ্রূণকোষকে বেছে নিয়ে তাকে আর একটু বিভাজিত হতে দিয়ে বহুকোষযুক্ত ভ্রূণে রূপান্তরিত করে তারপর একটা নির্দিষ্ট সময়ে পুনরায় মায়ের গর্ভে প্রতিস্থাপন করলে সেটা একটা পূর্ণাঙ্গ ভ্রূণ হিসেবে আর পাঁচটা সাধারণ গর্ভাবস্থার মতো একই পথে অগ্রসর হবে।('কৃত্রিম গর্ভাধান' (In vitro fertilization, বা সংক্ষেপে, IVF) পদ্ধতির অপেক্ষাকৃত বিশদ বিবরণের জন্য ডা. কাঞ্চন মুখার্জির লেখা উপরোক্ত **'সারোগেসি'** নিয়ে প্রবন্ধ দেখতে পারেন।)

কিন্তু আজ শুধু মাত্র দুরারোগ্য বন্ধ্যাত্বের চিকিৎসা হিসেবে IVF করা হয় না, অন্যান্য কতগুলো মূল পদ্ধতির পার্শ্বপ্রক্রিয়া হিসেবে করা হয়। তার মধ্যে আমাদের আগ্রহের বিষয় হল 'প্রাক-গর্ভাধান জিন-ঘটিত রোগ নির্ণয়' (Pre-implantation Genetic Diagnosis/Screening, বা সংক্ষেপে, PGD/S)। PGD/S হল এমন একটা নতুন ধরনের পরীক্ষা যার মাধ্যমে একটা

সদ্যজাত ভ্রূণের মধ্যে প্রতিটা ডিএনএ পরীক্ষা করে বলে দেওয়া সম্ভব যে সেগুলোর ভিতর কোনো বিশেষ ত্রুটিযুক্ত জিন রয়েছে কি না। এর ফলে জন্মের আগেই জানা যেতে পারে যে বড়ো হলে ভবিষ্যতে সেই শিশুর মধ্যে কোনো মারাত্মক বা জীবনহানিকর জিনঘটিত রোগ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে কি না। এই পরীক্ষার জন্য IVF হল অন্যতম প্রাক্‌শর্ত, যার মাধ্যমে অনেকগুলো সদ্যজাত ভ্রূণ এক সঙ্গে সৃষ্টি করা যায়। যদি কোনো একটা ভ্রূণে এ রকম কোনো ত্রুটি নির্ণয় করা যায়, তা হলে সেই ভ্রূণটাকে বাতিল করে অন্য আরেকটা ভ্রূণের ওপর একই পরীক্ষা চালানো হয়। যে ভ্রূণটার মধ্যে সেই বিশেষ জিন সম্পর্কিত ত্রুটি শনাক্ত করা যাবে না, সেই ভ্রূণকেই মনোনীত

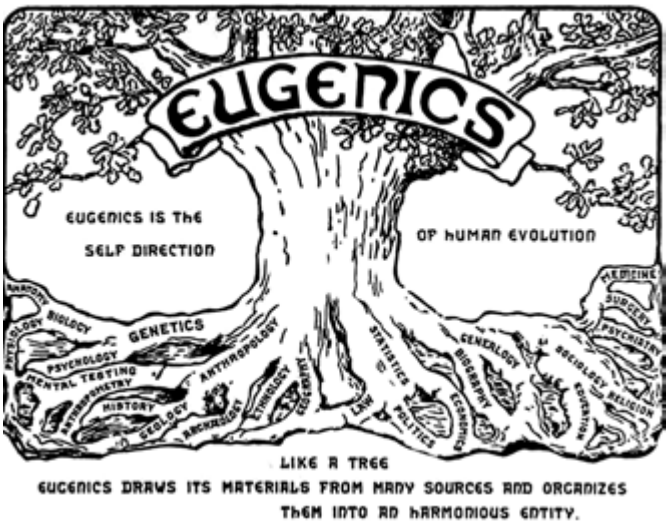

করা হবে এবং তাকে মায়ের গর্ভে প্রতিস্থাপন করা হবে। সমস্ত জেনেটিক রোগের জন্য একটা মাত্র জিন দায়ী হয়, তা কিন্তু নয়; অনেক সময়েই একাধিক জিন ত্রুটিযুক্ত হওয়ার ফলে একটা জেনেটিক রোগ হয়। সিকল সেল অ্যানিমিয়া জাতীয় রোগ হল এক-জিন ঘটিত রোগ। মা কিংবা বাবা যদি এমন কোনো এক-জিন ঘটিত রোগে ভোগেন, বা তার বাহক হন, একমাত্র সেই ধরনের রোগের ক্ষেত্রে PGD পরীক্ষাটার মাধ্যমে ভ্রূণের ভবিষ্যতে সেই রোগ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে কি না তা একটা দূর অবধি নিশ্চিন্ত ভাবে বলা যায়। কিন্তু এই রকম এক-জিন সম্বন্ধীয় বংশগত রোগের সংখ্যা কিন্তু তুলনামূলক

- 'কৃত্রিম গর্ভাধান' (IVF) পদ্ধতিতে অনেকগুলো ডিম্বাণু ও শুক্রাণু নিয়ে দেহের বাইরে কৃত্রিম উপায়ে তাদের মিলন ঘটিয়ে প্রাথমিক ভ্রূণকোষ তৈরি করা হয়।
- পিতামাতা বাহিত বংশগত (জেনেটিক) অসুখের ক্ষেত্রে IVF পদ্ধতি কাজে লাগিয়ে প্রথমে অনেকগুলো 'প্রাথমিক ভ্রূণকোষ' তৈরি করা হয়।
- সেই ভ্রূণকোষগুলোর মধ্যে বংশগত রোগের জিনটা আছে কি না তা খুঁজে দেখা হয়।
- যে সব ভ্রূণকোষের মধ্যে রোগের কারণ জিনটা নেই সেই ভ্রূণকোষগুলো মাতৃগর্ভে স্থাপন করা হয় ও গর্ভাবস্থার শেষে স্বাভাবিক শিশু জন্মায়।
- এক জিনঘটিত রোগের ক্ষেত্রে এটা সম্ভব, কিন্তু বহু জিনঘটিত রোগের ক্ষেত্রে এটা এখনও অসম্ভব।

ভাবে খুবই কম। এদের মধ্যে চেনা রোগগুলো হল বিটা থ্যালাসেমিয়া (beta-thalassemia), সিকল সেল অ্যানিমিয়া (sickle cell anaemia), সিস্টিক ফাইব্রোসিস (cystic fibrosis) ইত্যাদি।

অথচ, অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, যে সব রোগ একই বংশের সদস্যদের মধ্যে তুলনায় বেশি আবির্ভূত হচ্ছে এবং বংশগত বহনের একটা স্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে, তাদের অনেকের ক্ষেত্রে কোনো নির্দিষ্ট অন্তর্নিহিত জিন এখনও অবধি খুঁজে বের করা সম্ভব হয়নি। কোনো কোনো ক্ষেত্রে একটা মূল 'অভিযুক্ত' জিনকে যদিও বা চিহ্নিত করা সম্ভব হয়েছে, কিন্তু সেখানেও দেখা গেছে যে শুধুমাত্র সেই জিনটার ত্রুটি থাকলেই সব সময় রোগটা হবেই এর কোনো নিশ্চয়তা নেই, কারণ মূল জিনটার সঙ্গে আরও অনেক আনুসঙ্গিক জিনসমূহের জটিল মিথস্ক্রিয়া এই রোগটা আবির্ভুত হওয়ার পেছনে কাজ করে। এই সব রোগের উদাহরণ হল ডায়াবেটিস, বিভিন্ন রকমের ক্যানসার ইত্যাদি। যেমন কিছু কিছু স্তন-ক্যানসারের ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে সেগুলো একই বংশের মহিলা সদস্যের মধ্যে বেশি মাত্রায় আবির্ভূত। অনেক গবেষণা করে এর অন্তর্নিহিত 'কারণ' BRCA নামক একটা জিনকেও আলাদা করা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, BRCA জিনটার মিউটেশন হলেই মহিলার স্তন ক্যানসার হবে— যদিও তা হওয়ার সম্ভাবনা কিছুটা বেশি হবে এই কারণে যে, এই সমস্ত বহু-জিন ঘটিত বংশগত রোগগুলোর জিন সঠিক ভাবে নির্ণয় করা এবং ভবিষ্যতে সেই রোগটা আদৌ আবির্ভূত হবে কি না, এটা নিশ্চিত ভাবে PGD/S-র সাহায্যে বলা কোনো ভাবেই সম্ভব নয়।

এর পরের সংখ্যায় *স্বাস্থ্যের বৃত্তে* আমরা দেখব, কেবল রোগ আটকানো নয়, বাবা-মা'র ইচ্ছেমতো নানা রূপ ও গুণ সন্তানের জিনে সঞ্চার করার একটা প্রচেষ্টা চালু আছে। চলতি কথায় আমরা বলি 'ডিজাইনার বেবি'। পণ্ডিতরা বলবেন 'লিবেরাল ইউজেনিকস'। লিবেরাল ইউজেনিকস বহু মানুষের কাছে বিজ্ঞানের চরম আশীর্বাদ। এবং আমাদের অনেকের কাছে এ হল একগুচ্ছ আশঙ্কাও।

লেখক পরিচিতি : ডা. সুমিত্রন বসু এমবিবিএস, এমডি। রেডিও-ডায়াগনিসস বিশেষজ্ঞ।

নবজাতকের খাদ্য খাবার

ষষ্ঠ পাঠ

স্তনদানের কিছু সমস্যা

মা শিশুকে স্তন্যদুগ্ধ পান করাতে গেলে নানা রকম সমস্যার সম্মুখীন হতে পারেন। মায়ের শারীরিক যে সব সমস্যা হয় বা যে সব সমস্যা স্তন্যদান সংক্রান্ত সেসব নিয়ে কিছু আলোকপাত করা দরকার – লিখছেন

ডা. স্বপন বিশ্বাস।

স্তন্যদুগ্ধ পান করাতে গেলে মা
যে সব সমস্যার সম্মুখীন হতে পারেন

১. অল্প দুধ বা দুধ কম (Insufficient milk) : বেশির ভাগ মায়ের মনে একটা প্রশ্ন আসে, তাঁর স্তনে যে দুধ হচ্ছে তা কি তাঁর সন্তানের পক্ষে যথেষ্ট? কোনও কোনও মা বলেন, তাঁর শিশু বার বার মুখের কাছে আঙুল নেয়, কাঁদে, রাত্রে ঠিক ঘুমোয় না। তাই মায়ের মনে হয়, তার বোধ হয় পেট ভরছে না, খেতে চাইছে। মায়ের ধারণা সত্যি নাও হতে পারে, আবার সত্যিই তাঁর স্তনে দুধ কম হতে পারে। তাই আগে দেখতে হবে, বুকের দুধে শিশুর চাহিদা পুরণ হচ্ছে কি না।

ধরে নিতে হবে শিশু যথেষ্ট দুধ পাচ্ছে, যদি জন্মের ৫ দিন পরে—

- স্তন দুধে ভরে যায়।
- শিশু দুধ পান করার সময় মা দুধ গেলার শব্দ পান।
- শিশু ২৪ ঘণ্টায় কমপক্ষে ৬ বার প্রস্রাব করে।
- শিশুর মল হলুদ হয়; সাধারণত প্রতিবার দুধ খাবার পরে শিশু মলত্যাগ করে।
- একবার দুধ খাবার ২/৩ ঘণ্টা পরে জেগে উঠে শিশু আবার দুধ খেতে চায়।
- খাওয়ার পরে শিশু শান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ে।
- শিশুর যদি ঠিক মতো ওজন বৃদ্ধি হয়।

— এগুলো হলে বুঝতে হবে স্তনে যথেষ্ট দুধ আছে।

অনেক শিশুই স্তনবৃন্ত চুষতে থাকে, মা মনে করেন শিশুর খিদে আছে। কিন্তু তা সত্যি নয়, খিদে না থাকলেও শিশু চুষতে থাকে। শিশুর মুখে আঙুল দিলেও শিশু আঙুল চোষে। এটা রিফ্লেক্সের জন্য হয়। বার বার ঘুম থেকে উঠে যাচ্ছে, কান্নাকাটি করছে, বিরক্ত করছে, বার বার হাত মুখের কাছে নিচ্ছে, এ সব লক্ষণ দিয়ে বুকের দুধের পরিমাণ কম হচ্ছে ধরে নেওয়া ঠিক নয়। আরও অনেক কারণে শিশু স্তনপানে বিরক্ত হতে পারে।

তার পরেও যদি সত্যি দেখা যায়, দুধ যথেষ্ট নয়, তখন কী কারণে দুধ কম হচ্ছে বা হতে পারে তা দেখতে হবে।

যে সব কারণে সাধারণত বুকের দুধ কম হতে পারে তা হল—

- শিশুকে সময় মতো খেতে না দেওয়া বা কম সময় ধরে খাওয়ানো। ঘড়ি ধরে নিয়ম মেনে খাওয়ানো, শিশুর ঘুমিয়ে পড়া, শিশুর খিদে পেলেও তাকে না খাইয়ে রাখা, শিশুর চাহিদা মায়ের ঠিক মতো বুঝতে না পারা এ সবের কারণে দুধ কম খাওয়ানো হতে পারে
- তাড়াহুড়ো করে অল্প সময় দুধ খাওয়ানো।
- শিশুকে আগে থেকেই অন্য খাবার দেওয়া।
- নিপলের ধাঁধা বা স্তনবৃন্ত ধাঁধা (আগে আলোচনা করা হয়েছে)।
- ঠিক মতো শিশুকে ধরতে না পারা, যার ফলে শিশু ঠিকমতো বুকের দুধ টানতে পারে না।
- দুর্বল অক্সিটোসিন (বা মিল্ক ইজেকশান) রেসপন্স আগেই আলোচনা করা হয়েছে। মায়ের বেশি দুশ্চিন্তা, স্তনে ব্যথা, শিশুর সঙ্গে মায়ের বন্ধন ঠিক মতো তৈরি না হওয়া, মা ও শিশুকে সামাজিক কারণে আলাদা রাখা, ইত্যাদি এর কারণ হতে পারে।
- পরিবার পরিকল্পনার জন্য ইস্ট্রোজেন জাতীয় ওষুধ খাওয়া।
- রাতের দুধ খাওয়া বন্ধ করে দেওয়া।
- স্তনে দুধ জমে যাওয়া।

এই সব কারণে বুকের দুধ কমে যেতে পারে।

কী করণীয়?

১. যে কারণে দুধ কম হচ্ছে, সেই কারণ নির্ণয় করে তার প্রতিকার করতে হবে।
২. যদি দুর্বল অক্সিটোসিন বা মিল্ক ইজেকশন রেসপন্স হয়, তবে কিছু পদ্ধতি আছে, সেগুলোর সাহায্যে এই রিফ্লেক্সকে শক্তিশালী করা যায়, ফলে দুধের জোগান বাড়ে।

মিল্ক ইঞ্জেকশন রেসপন্স কম হওয়া

- মাকে ভরসা দিতে হবে, মাকে নিশ্চিন্ত রাখতে হবে।
- শিশুর সঙ্গে মায়ের বন্ধন দৃঢ় করতে হবে।
- বুকে গরম সেক (জল বা কাপড়ের) নিলে উপকার হয়।
- স্তন ম্যাসাজ করলে উপকার হবে। হাত স্তনের ওপর রেখে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ধীরে ধীরে হাতকে নিপলের বা স্তনবৃন্তের দিকে আনতে হবে। অ্যারিওলার চারপাশেও ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ম্যাসাজ করতে হবে (ছবি অনুযায়ী)

স্তন ম্যাসাজ করার পদ্ধতি

- স্তনে টোকা মারলেও (stroke) কাজ হয়। বাইরে থেকে শুরু করে তারপর ধীরে ধীরে স্তন বৃন্তের দিকে টোকা মারতে হবে।
- সামনের দিকে ঝুঁকে স্তনকে নাড়ালেও এই রিফ্লেক্স বেশি হয়।

- মা সামনের দিকে ঝুঁকে টেবিলের ওপর হাত রেখে সেই হাতের ওপর মাথা ঝুঁকিয়ে থাকবেন। স্তন নীচের দিকে ঝুলে থাকবে। অন্য কেউ মায়ের উন্মুক্ত পিঠে ধীরে ধীরে যদি ঘাড়ের ওপর থেকে নীচে এবং নীচে থেকে ওপরের দিকে হাত মুঠো করে ১-২ মিনিট ধরে পিঠে ঘসে বা ম্যাসাজ করে, তবে উপকার হয়।

৩. আগেই আলোচনা করা হয়েছে, কিছু খাদ্য মায়ের বুকের দুধ বাড়ায়। মাকে সেই খাবার বেশি করে খেতে হবে।

৪. মাকে যথেষ্ট পরিমাণ জল খেতে হবে, বিশ্রাম নিতে হবে।

৫. ২৪ ঘণ্টায় মা কমপক্ষে ১০ বার তার শিশুকে খাওয়াবে। অন্তত প্রতি ২ ঘণ্টা অন্তর, এ ছাড়া শিশু যখন খেতে চাইবে তখন খাওয়াতে হবে। অনেক সময় ধরে, যতক্ষণ শিশু খেতে চায়, ততক্ষণই খাওয়াতে হবে। রাতেও শিশুকে বুকের দুধই খাওয়াতে হবে।

৬. প্রথম দিকে স্তনে দুধ না এলে হাত দিয়ে স্তন চেপে খানিকটা দুধ বের করে শিশুর মুখে দিতে হবে। শিশু সেই দুধের স্বাদ পেয়ে আরও পাওয়ার জন্য বেশি করে টানবে। এমনকী, তাও যদি না হয়, তবে শিশু দুধ টানার সময় বাইরে থেকে ড্রপারে করে শিশুর মুখের পাশ দিয়ে দুধ দেওয়া যায়, সেই দুধের স্বাদ পেয়েও শিশু আরও বেশি চুষবে, ফলে বেশি দুধ তৈরি হবে।

১. ওষুধ খেয়ে দুধ বাড়ানো :

আমরা আগে দেখেছি, প্রোল্যাকটিন নামক হরমোন দুধ তৈরিতে সাহায্য করে। 'ডোপামিন' নামক পদার্থ এই প্রোল্যাকটিনকে প্রতিহত করে। তাই যে সব ওষুধ ডোপামিনকে বাধা দেয় বা অকেজো করে, পরোক্ষ ভাবে তারা দুধের জোগান বাড়ায়। এই জাতীয় ওষুধের মধ্যে ডোমপেরিডন (Domperidone) ও মেটোক্লোপ্রামাইড (Metoclopramide) বেশি ব্যবহৃত হয়। এই দুই প্রকার ওষুধ সাধারণ ভাবে বমি হলে ব্যবহার করা হয়। তবে এই সব ওষুধ যে মাত্রায় ব্যবহার করতে হয়, তার পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া আছে। তাই সব সময় ডাক্তারের নির্দেশে এবং তত্ত্বাবধানে ব্যবহার করা উচিত।

২. স্তনবৃন্ত ফেটে যাওয়া, ব্যথা হওয়া বা রক্ত পড়া
(Cracked or bleeding nipple) :

এই সমস্যায় অনেক মায়েরা ভোগেন। স্তন পান করালে এটা ঘটতেই পারে। প্রথম দিকে হয়তো বোঝা যায় না, কিন্তু শিশুর দুধ খাওয়ার সময় যদি স্তনে ব্যথা লাগে, তখন অবশ্যই ভালো করে স্তনবৃন্ত দেখে নিতে হবে।

- ঠিক মতো শিশুকে ধরা না হলে সে এদিক ওদিক ঘুরিয়ে স্তন চুষতে থাকে। তখন স্তনবৃন্তে আঘাত লাগতে পারে। তাই এর প্রধান কারণ শিশুকে ঠিক মতো না ধরা। ঠিক ভাবে শিশুকে ধরলে অনেক সময় এই সমস্যা নিজেই ঠিক হয়ে যায়।
- আবার অনেক সময় পাম্প করে দুধ বের করার সময় স্তনের ক্ষতি হতে পারে।
- শিশুর মুখের ছত্রাক জনিত ঘা বা থ্রাস (thrush) মায়ের স্তনে সংক্রামিত হয়েও এই সমস্যা তৈরি করতে পারে। সে ক্ষেত্রে স্তন লাল হয়ে যায়, চুলকায়, চকচক করে এবং খুব ব্যথা হয়।
- শুকনো চামড়া বা একজিমা থাকলেও স্তনবৃন্ত ফেটে যেতে পারে।

কী করণীয়?

- শিশুকে ঠিক মতো বুকে ধরতে হবে। যে ভাবে ধরা হচ্ছে, প্রয়োজনে সেই অবস্থান পাল্টে অন্য ভাবে ধরতে হবে।
- দুধ খাওয়ানোর আগে ঠান্ডা সেঁক দিলে ব্যথা কম হয়।
- স্তনবৃন্ত সব সময় পরিষ্কার রাখতে হবে।
- জীবাণুনাশক মলম লাগাতে হবে।
- প্রতি বার দুধ খাওয়ানোর পর ল্যানোলিন জাতীয় মলম স্তনে লাগালে কাজ হয়।
- হাইড্রোজেল ড্রেসিং প্যাড লাগালেও তাড়াতাড়ি সারে।
- দরকারে ডাক্তারের পরামর্শে অ্যান্টিবায়োটিক ও ব্যথার ওষুধ খেতে হবে।

শিশুর অবশ্য এতে সরাসরি ক্ষতি হয়

না। ঠিক মতো ধরা না হলে শিশুর দুধের অভাব ঘটবে, কিন্তু শিশুর বুকের দুধ বন্ধ করার দরকার নেই। বড়জোর ব্যথার হাত থেকে বাঁচতে এক দু'দিন শিশুকে পাম্প করে দুধ বের করে খাওয়ানো যেতে পারে।

৩. বন্ধ দুগ্ধ নালিকা (blocked duct)

আমরা আগের আলোচনায় দেখেছি, অ্যালভিওলাই থেকে দুধ এসে অ্যারিওলার নীচে সাইনাসে জমা হয়, তারপর সেই দুধ দুগ্ধ নালিকা দিয়ে স্তনবৃন্তে আসে এবং শিশু গ্রহণ করে। এই দুগ্ধ নালিকা অনেক সময় খোলা থাকে না। এর মুখ চামড়া দিয়ে বন্ধ থাকে। বন্ধ থাকলে আর দুধ বের হতে পারবে না। দুগ্ধ নালিকার দুধ ভিতর থেকে চাপ দেয়, ফলে স্তনবৃন্তের মুখে কিছু সাদা ফোলা বিন্দু দেখা যায়। এগুলো ওই বন্ধ নালিকার মুখ। সহজেই সেই সাদা চামড়া তুলে সরিয়ে নেওয়া যায়, তখন দুগ্ধ নালিকা উন্মুক্ত হয় এবং দুধ বেরিয়ে আসে। বন্ধ দুগ্ধ নালিকার এটা একটা কারণ।

কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই স্তনে বা দুগ্ধ নালিকায় সংক্রমণের ফলে দুগ্ধ নালিকা বন্ধ হয়ে যায়। তখন স্তনে ব্যথা হয়, ফুলে যায়, লাল হয়ে যায়, জ্বরও আসতে পারে। ব্যথা হলে সতর্ক হয়ে চিকিৎসা করাতে হবে। শিশু দুধ না খেলে বা কম খেলে দুধ জমে গিয়েও দুগ্ধ নালিকা বন্ধ হয়ে যেতে পারে। অনেক সময় কোনো সংক্রমণ ছাড়াও মায়ের গা ম্যাজ ম্যাজ করা, ব্যথা, জ্বর ভাব, অর্থাৎ ফ্লু'র মতো উপসর্গ দেখা দিতে পারে। মায়ের বুকের দুধ মায়ের রক্তে মিশে অ্যান্টিজেনের মতো কাজ করে। তার ফলে এই সব উপসর্গ দেখা দেয়।

কী করণীয় :

- শিশুকে বুকের দুধ খাইয়ে যেতে হবে।
- শিশুকে ঠিক মতো ধরতে হবে যাতে সে ঠিকমতো দুধ টেনে স্তন ফাঁকা করতে পারে।
- 'প্যারাসিটামল' জাতীয় ওষুধ খেলে উপকার হয়; ভিটামিন 'সি' ও 'বিটা ক্যারোটিন' খেলেও ব্যথা ও অস্বস্তি কমতে পারে।
- দুধ বেশি জমে থাকলে ব্রেস্ট পাম্প দিয়ে দুধ বের করে নিতে হবে।
- ঠান্ডা-গরম সেঁক দিলে ব্যথার উপসম হয়।
- যথেষ্ট বিশ্রাম নিতে হবে; পরিষ্কার পোশাক পরতে হবে।
- মায়ের অন্তর্বাস যেন টাইট না হয়।
- সংক্রমণ ঘটলে ডাক্তারের পরামর্শে ওষুধ খেতে হবে।

৪. থ্রাস (Thrush) বা ছত্রাক সংক্রমণ :

অনেক সময় শিশুর মুখে সাদা সাদা দইয়ের মতো জমা হয়। মা মনে করেন দুধ জমে আছে। অনেক মা-ই মধু কাপড়ে জড়িয়ে ঘসে ঘসে সেই দুধ পরিষ্কার করতে যান। কিন্তু সব সময় এটা দুধ থাকে না। এক ধরনের ছত্রাক ঘটিত রোগের কারণে এই সাদা ঘা হয়। ঘষলে সাদা উঠে গিয়ে মুখ লাল হয়ে যায়, অনেক সময় রক্ত বেরোতে পারে। আর মধুও শিশুর মুখে লাগানো উচিত নয়। এই রোগকে ডাক্তারি ভাষায় বলে থ্রাস (Thrush)। শিশুর মুখ থেকে এটা মায়ের স্তনবৃন্তেও সংক্রমণ ঘটাতে পারে। স্তনবৃন্ত লাল হয়, ফুলে যায়, ব্যথা হয়, চুলকায়। শিশুর ক্ষেত্রে এই সংক্রমণ শুধু মুখেই হয় না, অন্যান্য ভিজে থাকা জায়গায়ও হয়। ন্যাপি র‍্যাস বা চামড়ার ভাঁজে ভাঁজে ও এই ছত্রাকের সংক্রমণ ঘটতে পারে।

কী করণীয় :

শিশুর মুখের সঙ্গে প্রতি বার দুধ খাওয়ার সময় স্তনবৃন্তের সংযোগ ঘটে, তাই চিকিৎসা শিশুর মুখের ও স্তনবৃন্তের---অর্থাৎ শিশুর ও মায়ের, দু'জনেরই করতে হবে। ওষুধ খেলে ও লাগালে সহজেই এই রোগ সারে। তাই অবিলম্বে ডাক্তার দেখানো উচিত। আর মনে রাখতে হবে, এটা ছোঁয়াচে রোগ। তাই—

- শিশুর খেলনা, ব্রেস্ট পাম্প ইত্যাদি ফুটিয়ে পরিষ্কার করতে হবে। জামা কাপড় ফুটিয়ে পরিষ্কার করতে হবে। জলে ভিনিগার মিশিয়ে নিলে ভালো হয়।
- স্তনবৃন্ত শুকনো রাখতে হবে।
- চিনি বা মিষ্টি জাতীয় খাবার কম খেতে হবে।
- পরিষ্কার জলে স্তন ও স্তনবৃন্ত ধুয়ে ফেলতে হবে।
- স্তনবৃন্তে 'জেনসান ভায়োলেট' ওষুধ লাগালে উপকার হয়।
- তবে অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে।

৫. স্তনে ব্যথা (Breast Pain) :

স্তনে কোনো সংক্রমণ ঘটলে, ঘা হলে, ছড়ে গেলে ব্যথা তো হয়ই, এছাড়াও, এ সব কিছু না হলেও কোনো কোনো মায়ের স্তনে ব্যথা হতে পারে। এর কারণ, শিশু স্তন পান করলে অক্সিটোসিন হরমোনের প্রভাবে স্তনে দুধ নেমে আসে। একে ডাক্তারি পরিভাষায় বলে 'লেট ডাউন' বা 'মিল্ক ইজেকশান রিফ্লেক্স'। যখন স্তনে দুধ নামে তখন স্তনে ব্যথা হতে পারে। প্রথম দিকে শিশু স্তনবৃন্ত চুষলেই দুধ নামে, তখন ব্যথা হয়। কিন্তু অনেক মায়ের ক্ষেত্রে পরের দিকে মা যখনই শিশুর কথা চিন্তা করে বা শিশুকে দুধ ছাড়া অন্য কিছু খাওয়ায়, তখনই এই ঘটনা ঘটতে পারে। কোনো কোনো মায়ের স্তন থেকে তখন দুধ বাইরেও বেরোতে থাকে। প্রসঙ্গত, কোনো কোনো মায়ের একই সঙ্গে জরায়ুর

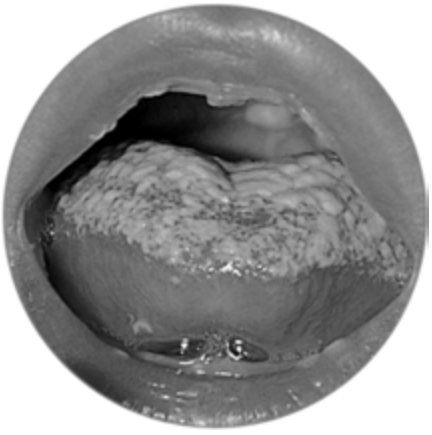

সংকোচনও ঘটে, ফলে তলপেটে ব্যথা হয়। সব মায়ের ক্ষেত্রে এমন নাও হতে পারে।

এই সময়ে হঠাৎ করে অনেক দুধ বেরিয়ে আসে, স্তন শক্ত হয়, শিশুর মুখ সহজে দুধে পরিপূর্ণ হয়ে যায়, তার খেতে অসুবিধা হয়। কখন দুধ বেশি বের হচ্ছে, অভিজ্ঞ মা তা অনুভব করতে পারেন। শিশু যখন চোষা শুরু করে, তার পরপরই যখন দুধ আসে, তখন যদি শিশুর মুখ সরিয়ে নেওয়া হয় এবং দুধের প্রথম ভাগ কোনো তোয়ালে বা পাত্রের ওপর ফেলা হয়, তা হলে তারপর শিশু বাকিটা সহজে খেতে পারে। শিশুর স্তন মুখে পুরতেও সুবিধা হয়। 'লেট ডাউন রিফ্লেক্স' ছাড়াও অন্য কারণে স্তনে ব্যথা হতে পারে।

- বেশি দুধ তৈরি হলেও দুধ জমে ব্যথা হতে পারে।
- ছত্রাকের সংক্রমণ বা 'থ্রাস' হলে স্তনে ব্যথা হতে পারে। আগেই আলোচনা করা হয়েছে।
- স্তনের সংক্রমণ হলে স্তনে ব্যথা হতে পারে। আগেই আলোচনা করা হয়েছে।
- স্তনের সংক্রমণ বা বন্ধ দুগ্ধ নালিকার জন্যে ব্যথা হতে পারে।
- অন্য কারণের মধ্যে আছে, ঠিক মতো ব্রেস্ট পাম্প ব্যবহার না করা, টাইট অন্তর্বাস পরা।
- ঋতুস্রাবের আগে ব্যথা হতে পারে।
- বুকের অন্য রোগ, বিশেষত : ফাইব্রোসিস্টিক ডিজিজের (Fibrocystic disease of breast) জন্যও ব্যথা হতে পারে।

কী করণীয়?

- যে ব্যথা হচ্ছে, তার চিকিৎসা ডাক্তারের পরামর্শে করতে হবে।
- ঠিক ভাবে শুতে হবে, যাতে বুকে চাপ না লাগে।
- কখনও কখনও সয়াবিনের খাবার খেলে ব্যথা কমে। সয়া খাবারের মধ্যে থাকা আইসোফ্লাভন (Isoflavones) ব্যথা কমায়।

৬. শিশু বুকের দুধ খেতে চায় না (Breast refusal) :

অনেক সময় শিশু বুকের দুধ খেতে চায় না। শিশু হয়তো আগে ঠিক মতোই খাচ্ছিল, হঠাৎ করেই সে বুকে ধরলে মুখ সরিয়ে নেয়। যেন 'ধর্মঘট' করে বুকের দুধ খাবো না বলে। এমন হলে বুঝতে হবে, কোথাও কোনো গোলমাল হয়েছে, তাই শিশু খেতে চাইছে না।

- শিশুর মুখে বা অন্য কোথাও ব্যথা হতে পারে। কানে ব্যথা— যা দুধ খাবার সময় বাড়ে।
- শিশুর মুখে ঘা বা থ্রাস হতে পারে।
- শিশুর নাক বন্ধ হতে পারে।
- শিশু ঝিমিয়ে থাকতে পারে। এর প্রধান কারণ হয়তো মায়ের কোনো ওষুধ।
- ঠিক মতো ধরা না হলে বুকের দুধ খাওয়া শিশুর পক্ষে বিরক্তিকর হয়, সে দুধ খাওয়া ছেড়ে দেয়। (এর সম্ভাব্য কারণ হতে পারে, বোতলে খাওয়ানো, শিশুর মুখ ঠিক জায়গায় না ধরা, শিশুর মাথা জোরে চেপে ধরা)।
- কোনো কোনো মা দুধ খাওয়ানোর সময় তার স্তন ধরে নাড়ায় বা ঝাঁকায়, এতে শিশু ঠিকমতো ধরতে পারে না।
- বুকে দুধ খুব বেশি এলে শিশুর খেতে অসুবিধা হয়, সে বুকের দুধ খেতে চায় না।
- শিশু ঠিকমতো স্তন মুখে নিতে না পারলে দুধ খেতে চাইবে না।
- 'নিপল ধাঁধা' বোতল এবং বুকের দুধ এক সঙ্গে খাওয়ালে হতে পারে— যা নিয়ে আগে আলোচনা করা হয়েছে।
- বুকে দুধ কম থাকা বা দুধ না পাওয়া।
- চারিদিকের গোলমাল বা কোলাহল।
- অপরিচিত পরিবেশ বা দীর্ঘক্ষণ শিশুকে মায়ের সঙ্গে না দেওয়া। এতে শিশুর রাগ বা অভিমান হয়।

কী করণীয়?

- অনেক শিশু জাগ্রত অবস্থায় বুকের দুধ খেতে না চাইলেও ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে ঠিক খেয়ে নেয়। তাই ঘুমন্ত অবস্থায় খাওয়ানোর চেষ্টা করা উচিত। তারপর অভ্যেস হয়ে গেলে শিশু জেগেও খেতে চাইবে। শিশুকে বার বার খাওয়ানোর চেষ্টা করতে হবে, কিন্তু জোর করে নয়।
- শান্ত পরিবেশে খাওয়ানোর চেষ্টা করতে হবে।
- শিশুকে গায়ের সঙ্গে এমন ভাবে ধরতে হবে, যাতে শিশুর গায়ের সঙ্গে মায়ের গায়ের সংযোগ ঘটে। অর্থাৎ শিশুর প্রতি বেশি মনোযোগ দিতে হবে।
- তেমন প্রয়োজনে হলে বুকের দুধ বের করে খাওয়াতে হবে।

এছাড়াও দুধ খাওয়ানোর সমস্যা আরও কিছু কারণে হতে পারে। সে-সব আলোচনা থাকবে *স্বাস্থ্যের বৃত্তে*-র পরের সংখ্যায়।

লেখক পরিচিতি : ডা. স্বপন বিশ্বাস, এমবিবিএস, ডিসিএইচ, এমডি, শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ। প্রাইভেট প্র্যাকটিস করেন।

ধর্মীয় অনুষঙ্গ বাদে

অন্নপ্রাশন

পুজো করে বাচ্চার মুখে প্রসাদ গুঁজে দেওয়ার যে প্রথা বাঙালি হিন্দুদের মধ্যে চালু আছে, 'অন্নপ্রাশন'-এর সেই দিকটা নিয়ে আমরা এখানে আলোচনা করছি না। আমরা বলছি, মাস ছ'য়েক বয়সে শিশুদের অর্ধশক্ত খাবার শুরু করার এক ঐতিহ্য আমাদের রয়েছে। আর ঐতিহ্যের এই দিকটা খুব বিজ্ঞানসম্মত। মায়ের দুধের সঙ্গে অর্ধশক্ত খাবারের নানা ধাপ পেরিয়ে এক বছর বয়সে কীভাবে শিশুকে পুরো পারিবারিক খাবার খাওয়ানো যায় সে কথা বিশদে লিখছেন **ডা. মানস মহাপাত্র।**

'যদি তুমি ঠিক ভাবে না খাও— কোনও ডাক্তার সারাতে পারবে না।
আর যদি ঠিকভাবে খাও— কোনও ডাক্তার দরকার হবে না।'
— ভিক্টর জি রচিনি (১৯৩০)।

সামাজিক সভ্যতা গড়ে ওঠার পর থেকে সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার তাগিদে প্রাচীন মানুষ নানা ধরনের রীতিনীতি নিয়ম-কানুনকে হাতিয়ার করেছিল। কালক্রমে বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে তার কিছু অংশ ভিত্তিহীন কুসংস্কার হিসাবে ও কিছু অংশ বিজ্ঞানসম্মত ভাবে ঠিক প্রমাণিত হয়েছে। অন্নপ্রাশন সম্পর্কে আমরা যা বুঝি— তা হল ছয় মাসের কাছাকাছি বয়সের শিশুর মুখে প্রথম ভাত বা চাল জাতীয় অর্ধশক্ত খাদ্য তুলে দেওয়া। আমাদের দেশে হিন্দুদের মধ্যে এই প্রথা বহুল প্রচলিত। তাই বলে অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যেও খাবারের এই প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করা হয় না তা কিন্তু নয়। শুভ কামনাকারীদের উপস্থিতিতে আল্লা বা ভগবানের কাছে শিশুর মঙ্গল কামনা করে এই অনুষ্ঠান করা হয়। তবে মেয়েদের ক্ষেত্রে ছয় মাসের থেকে একটু আগে বা দেরিতে (৫ মাস বা ৭ মাস বয়সে) অন্নপ্রাশন করা হয়ে থাকে, সেটার কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই।

অন্নপ্রাশন কী?

আসুন, জেনে নেওয়া যাক অন্নপ্রাশনের বিজ্ঞানসম্মত দিকটা সম্পর্কে কিছু কথা। আমরা অন্নপ্রাশন বলতে এখানে খাবারের পরিবর্তনের কথাটাই বলব, পুজো বা অনুষ্ঠানের কথা নয়। পুষ্টি বিজ্ঞানের কথা অনুসারে 'অন্নপ্রাশন' ঠিক ভাবে করা বলতে কিন্তু শিশুকে শুধুমাত্র মুখে ভাত বা চাল জাতীয় অর্ধশক্ত খাদ্য তুলে দেওয়ার অনুষ্ঠানকে বোঝায় না। সহজ করে বললে এখানে অন্নপ্রাশন বলতে শিশুকে তরল খাদ্য (মায়ের দুধ) থেকে অর্ধশক্ত খাদ্যের মধ্যে দিয়ে ধীরে ধীরে শক্ত খাদ্য অর্থাৎ পারিবারিক খাদ্য খাওয়ানোর অভ্যাস তৈরি করার সুনির্দিষ্ট পদ্ধতিকে বোঝায়। আর তা ছয় মাস বয়স থেকে শুরু করতে হয়— ছেলে এবং মেয়ে উভয় শিশুর ক্ষেত্রে।

বিজ্ঞানসম্মত অন্নপ্রাশন প্রয়োজন কেন?

জন্মের পর প্রতিটা শিশুর স্বাভাবিক ভাবে বেড়ে ওঠার জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণে ও নির্দিষ্ট অনুপাতে বিভিন্ন খাদ্য উপাদানের প্রয়োজন। বয়স ও ওজন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তার চাহিদা ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে। দেখা গেছে প্রথম ছয় মাস বয়স পর্যন্ত শিশুর প্রয়োজনীয় পুষ্টি শুধুমাত্র বুকের দুধের মাধ্যমে দেওয়া সম্ভব। তাছাড়া বুকের দুধের অন্যান্য উপকারিতা রয়েছে। তাই প্রথম ছয় মাস প্রতিটা শিশুকে শুধুমাত্র বুকের দুধ (Exclusive Breast Feeding) খাওয়ানো প্রয়োজন। যদিও কয়েকটা বিরল, বিশেষ ক্ষেত্রে বুকের দুধ খাওয়ানো বারণ করা হয়ে থাকে।

কিন্তু ছয় মাসের পর থেকে শিশুর ওজন বেড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পুষ্টির

(ক্যালরি, মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট) চাহিদাও নির্দিষ্ট অনুপাতে বাড়তে থাকে। এই বর্ধিত চাহিদা আর শুধুমাত্র বুকের দুধের দ্বারা মেটানো সম্ভব হয় না। তাই এই সময় থেকে প্রতিটা শিশুকে বুকের দুধের সঙ্গে সঙ্গে অর্ধশক্ত খাদ্য শুরু করা প্রয়োজন। ফলে তার ধীরে ধীরে শক্ত খাদ্য খাওয়ার অভ্যাস তৈরি হয়— এবং ১ বৎসর বয়সের কাছাকাছি সময়ে শিশু সমস্ত ধরনের পারিবারিক খাদ্য গ্রহণ করতে সক্ষম হয়। তবে, কয়েকটা বিশেষ ক্ষেত্রে ৬ মাসের আগে থেকেই অন্নপ্রাশনের নির্দেশ দেওয়া হয়।

৬ মাসের আগে অন্নপ্রাশন নয় কেন?

১. প্রথম ৬ মাস পর্যন্ত শিশুর সমস্ত প্রয়োজনীয় পুষ্টি শুধুমাত্র বুকের দুধের থেকে দেওয়া সম্ভব।
২. এই সময় শিশুর ঘাড় শক্ত হয় (৪ মাস), এবং হাত ও মুখের সমন্বয় তৈরি হয়। শিশু অর্ধশক্ত খাদ্য গ্রহণে সক্ষম হয়।
৩. অগ্ন্যাশয়ের অ্যামাইলেজ উৎসেচক এই সময় পরিপক্ক (Mature) হয়। আমাদের খাদ্যনালী দানাশস্য ও ডালজাতীয় খাদ্য গ্রহণের ক্ষমতা অর্জন করে।
৪. শিশুর দাঁতের মাড়ি শক্ত হয়। সে অর্ধশক্ত খাবার চিবানো উপভোগ করে।
৫. ৬ মাসের আগে অন্নপ্রাশন করলে— অপরিণত খাদ্য তন্ত্র, ঠিক ভাবে এবং ঠিক ঘনত্বের খাদ্য তৈরি না করা হেতু জীবাণুর সংক্রমণ, ডায়রিয়া ইত্যাদির কারণে অপুষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকে।

৬ মাসের পরে নয় কেন?

৬ মাসের পর থেকে শিশুর পুষ্টি উপাদানের বর্ধিত চাহিদা শুধুমাত্র বুকের দুধের দ্বারা মেটানো সম্ভব না হওয়ায় ক্যালরি, মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট, আয়রন, প্রোটিন, ভিটামিন, ক্যালসিয়াম ইত্যাদির অভাব ঘটে। ধীরে ধীরে শিশুর অপুষ্টি হয়।

অন্নপ্রাশনের খাদ্য :

দুই প্রকারের হতে পারে। (১) হোমমেড বা বাড়িতে তৈরি (২) রেডিমেড খাদ্য।

বাজারের রেডিমেড খাদ্যে বয়স অনুপাতে পরিমাণ মতো পুষ্টি থাকলেও তা কখনওই সস্তা নয়, এবং তা সব সময় সর্বত্র পাওয়া যায় না, বা গ্রহণযোগ্য হয় না। তাই বাড়িতে তৈরি খাদ্যকে অধিক প্রাধান্য দেওয়া উচিত। এ ক্ষেত্রে

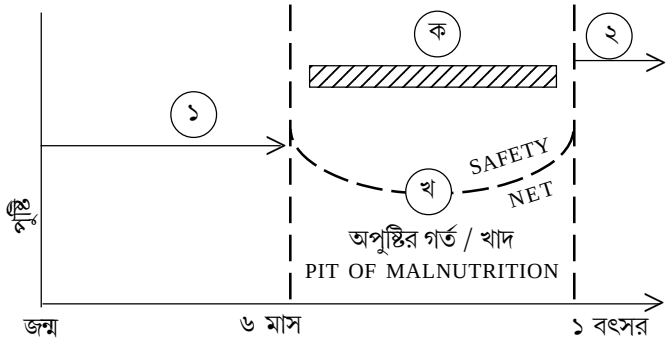

খাদ্য উপাদানগুলো প্রাকৃতিক (Natural) ও বিশুদ্ধ (fresh) হয়, সহজেই পাওয়া যায়, অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য হয়। বাড়িতে তৈরি খাদ্য বিভিন্ন ধরনের (versatile) হওয়ায় বাচ্চাকে ভিন্ন ভিন্ন স্বাদের খাবারে অভ্যস্ত করা যায়। এবং এই খাদ্য অনেকটা পারিবারিক খাদ্যের মতো হওয়ায় পরবর্তী ক্ষেত্রে (১ বৎসর বয়সে) পুরোপুরি পারিবারিক খাদ্য খাওয়ানোর সময়ে কোনও সমস্যা হয় না।

তবে বাড়িতে তৈরি খাদ্যের কয়েকটা অসুবিধা রয়েছে। যেমন খাদ্য তৈরির সময়ে অনেকটা মাইক্রো নিউট্রিয়েন্ট ও ভিটামিনের পরিমাণ কমে যায়। তাছাড়া, চাহিদা অনুপাতে পুষ্টিগত গুণাবলী ধরে রাখা কঠিন হতে পারে। তাই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নভাবে ধৈর্য ধরে খাবার তৈরি করতে হবে। এর সঙ্গে অতিরিক্ত গুড় বা চিনি ১-২ চামচ, দুধ, তেল/ঘি (অল্প পরিমাণ) মিশিয়ে পুষ্টিগত গুণাবলী বাড়িয়ে নেওয়া প্রয়োজন।

বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন ধরনের খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা :

১. প্রথম ৬ মাস— পুষ্টির চাহিদা তরল খাদ্য (মায়ের দুধ) দ্বারা মেটানো সম্ভব।
২. ১ বৎসরের পর থেকে শিশুর পুষ্টি পারিবারিক স্বাভাবিক খাদ্য (শক্ত খাদ্য) থেকে আসে।

(ক) + (খ) ৬ মাস থেকে ১ বৎসর। সঠিক ভাবে শিশুর পরিচর্যা না করলে প্রতিটা শিশু অপুষ্টির কবলে পড়ে যায়। তাই অন্নপ্রাশনের (অর্ধশক্ত খাদ্য) প্রয়োজন।

(ক) ব্রিজ / BRIDGE - অর্থাৎ অপুষ্টি অতিক্রম / দূর করার জন্য যেগুলো করা দরকার তা হল—

১. বুকের দুধ খাওয়ানো চালিয়ে যাওয়া।
২. উদ্ভিদজ / ডালজাতীয় খাদ্যের প্রোটিন।
৩. প্রাণীজ প্রোটিন (মাছ, ডিম, দুধ)
৪. শর্করা জাতীয় অর্ধশক্ত খাদ্য।

(খ) আমাদের দেশে সবাই সুষম খাদ্য পায় না। তাই বাচ্চাদের জন্য অতিরিক্ত খাদ্য নিরাপত্তার সামাজিক ব্যবস্থা দরকার। একে আমরা সেফটি নেট বা অতিরিক্ত পুষ্টির ব্যবস্থা (Added Nutrition) বলতে পারি। এর অন্তর্গত যে ব্যবস্থা করা যেতে পারে তা হল—

১. সম্পুরক খাদ্য (supplementary) খাদ্যের ব্যবস্থা। যেমন--- আই.সি.ডি.এস. প্রকল্প প্রতি শিশুকে প্রতিদিন ৩০০ ক্যালরি খাদ্য সরবরাহ করে।
২. দলবদ্ধ ভাবে (গ্রুপ ইটিং) অতিরিক্ত খাদ্য খাওয়ানোর ব্যবস্থা।
৩. অল্প পরিমাণে বারবার খাওয়ানো— সাধারণত খেলাধূলার সময়ে এবং একটা নির্দিষ্ট পাত্র থেকে।

শিশুকে 'অন্নপ্রাশন' ও তার পরের খাবার খাওয়ানোর পদ্ধতি : কয়েকটা সাধারণ নিয়ম।

১. এই খাদ্য সহজলভ্য, সস্তা ও গ্রহণযোগ্য হবে।
২. শর্করা জাতীয় (দানা শস্য) খাদ্য দিয়ে অন্নপ্রাশন শুরু করা উচিত। প্রথমে এক ধরনের দানা শস্য থেকে ধীরে ধীরে দু-তিন ধরনের দানা শস্যের

খাবার দিতে হবে। ১ মাস পর থেকে (৭-৭.৫ মাস বয়সে) প্রোটিন জাতীয় খাদ্য শুরু করা ভাল।

৩. প্রথম ২-৩ মাস (অন্নপ্রাশন শুরু করার পর) বাঁধাকপি, বীট না দেওয়া ভাল। কারণ, এতে প্রচুর পরিমাণে নাইট্রেট থাকে।

৪. সামুদ্রিক মাছ এবং ডিমের সাদা অংশ অ্যালার্জির কারণ হতে পারে। তাই এগুলো ৮/৯ মাস বয়সের আগে খাওয়ানো উচিত নয়।

৫. অর্ধশক্ত খাদ্য দিয়ে শুরু করতে হবে। ধীরে ধীরে শক্ত খাদ্য খাওয়ানোর অভ্যাস তৈরি করতে হবে।

৬. কিছু কিছু বাচ্চার ক্ষেত্রে (কয়েকটা বিশেষ রোগ ও বিরল রোগ থাকলে) রাই, বার্লি, ভুট্টা (গ্লুটেন যুক্ত খাদ্য) খাওয়ানো বারণ করা হয়।

৭. বাড়িতে তৈরি খাদ্যের সঙ্গে ১-২ চামচ চিনি বা গুড়, অল্প তেল বা ঘি, একটু দুধ মিশিয়ে পুষ্টিগুণ বাড়িয়ে নিতে হবে।

দাঁত বেরোনোর পর থেকে বাচ্চা চিবোতে পছন্দ করে। তাই নরম, অর্ধশক্ত খাদ্য থেকে ধীরে ধীরে শক্ত খাদ্য খাওয়াতে হবে।

বয়স অনুপাতে খাদ্যের তালিকা :

৬ মাসের সময়ে : শর্করা জাতীয় — যেমন সুজি, রুটির পাতলা অংশ, খিচুড়ি, ইত্যাদি। একটু দুধ, ১-২ চামচ চিনি, একটু তেল বা ঘি মিশিয়ে নিতে হবে। ১-২ চামচ করে শুরু করে ধীরে ধীরে ১/২-১ কাপ খাওয়াতে হবে। দিনে ১-২ বার। ফলের রসও দেওয়া যেতে পারে।

৬-৯ মাস বয়সে : ভাত, আলু, ডাল, মূল জাতীয় (গাজর, বিট) শাক সবজি, বিভিন্ন ফল, বিস্কুট, কলা, ডিমের কুসুম, মাছ ইত্যাদি নরম / অর্ধশক্ত করে খাওয়ানো যেতে পারে। পায়েস, সুপ, দুধও দেওয়া যায়। ১-২ চামচ চিনি একটু তেল বা ঘি মেশাতে হবে প্রতিবার খাওয়ানোর সময়। দিনে ৪-৫ বার খাওয়াতে হবে।

৯-১২ মাস বয়সে : নরম খাদ্য যা চিবানো যায়, তা থেকে ধীরে ধীরে সমস্ত ধরনের পারিবারিক খাদ্য খাওয়ানো শুরু করতে হবে, যাতে ১ বৎসর বয়সে সমস্ত পারিবারিক খাদ্য খেতে পারে। দিনে ৪-৬ বার পর্যন্ত খাওয়াতে হবে। ধীরে ধীরে পরিমাণ বাড়াতে হবে।

কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ কথা যা সর্বদা মনে রাখতে হবে :

১. অর্ধশক্ত বা শক্ত খাবার খাওয়ানো শুরুর সঙ্গে সঙ্গে বুকের দুধ খাওয়ানো বন্ধ করা যাবে না। কমপক্ষে দুই বছর বুকের দুধ খাওয়ানো চালু রাখতে হবে। কারণ, মস্তিষ্কের বৃদ্ধির জন্য যে বিশেষ উপাদানের প্রয়োজন তা বুকের দুধের মধ্যে থাকে। এবং মস্তিষ্কের বৃদ্ধির বেশির ভাগটাই প্রথম দু'বছরে হয়।

২. অন্নপ্রাশনের ও তার পরের খাদ্য সর্বদা অর্ধশক্ত (Thick) হবে। জল মিশিয়ে পাতলা করা যাবে না। তাতে অপুষ্টি হতে পারে।

৩. শিশুর খাদ্য বানানোর সময় ও তা সংরক্ষণ করার সময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে হবে। রান্না করা এবং বাচ্চাকে খাওয়ানোর আগে পরিষ্কার জলে হাত ধুয়ে নিতে হবে। বাচ্চার খাদ্য সর্বদা টাটকা / সদ্য তৈরি হলে ভাল হয়।

৪. দাঁত বেরোনোর পর থেকে বাচ্চা চিবোতে পছন্দ করে। তাই নরম, অর্ধশক্ত খাদ্য থেকে ধীরে ধীরে শক্ত খাদ্য খাওয়াতে হবে। যাতে খাদ্য খেতে পারে। ১ বৎসরের কাছাকাছি সময়ে সমস্ত ধরনের পারিবারিক শক্ত (solid) খাদ্য খেতে পারে।

৫. খাবারের স্বাদের দিকটা মাথায় রাখতে হবে। নতুন নতুন স্বাদের খাবার দিতেহবে— ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতিতে বানিয়ে বা নতুন শাকসবজী ফল ইত্যাদি মূল খাবারের সঙ্গে মিশিয়ে। অর্থাৎ বিভিন্ন স্বাদের ও বিভিন্ন ধরনের খাদ্যের সঙ্গে শিশুকে পরিচিত করতে হবে।

৬. অসুস্থতার সময়ে বুকের দুধ খাওয়ানো চালু রাখতে হবে। সহজপাচ্য নরম খাদ্য অল্প পরিমাণে ২-৩ ঘণ্টা অন্তর অন্তর দিতে হবে। সুস্থ হওয়ার পর ১-২ সপ্তাহ অতিরিক্ত একটা মিল খাওয়াতে হবে। যাতে ওজনের ঘাটতি, যা অসুস্থতার সময়ে হয়েছিল, তা পূরণ করা যায়।

৭. বাচ্চা খেতে চাইলে তাকে অর্ধশক্ত খাদ্য ও বুকের দুধ একসঙ্গে দেওয়া যাবে না। অর্থাৎ কোনও বারে বুকের দুধ খাওয়ালে তার পরের বারে অর্ধশক্ত খাবার দিতে হবে।

সর্বোপরি, নিয়মিত বাচ্চার বৃদ্ধির পরিমাপ করা, ওজন নেওয়া, কোনও রকম অসুস্থতা থাকলে তাড়াতাড়ি ডাক্তার দেখানো ইত্যাদির দিকে নজর দিতে হবে। বাচ্চার বেড়ে ওঠা অন্যান্য সুস্থ বাচ্চার মতো হচ্ছে কি না, তা দেখতে হবে।

পরিশেষে বলে রাখি— আপনাদের জানা দরকার যে আমাদের দেশে ৬৫% অর্থাৎ ৮ কোটির কাছাকাছি ৫ বৎসরের নীচের বাচ্চারা অপুষ্টিতে ভোগে। তাই সঠিকভাবে, সঠিক পদ্ধতিতে, পুষ্টিকর খাদ্য শিশুকে দিতে হবে। আবার অতি উৎসাহী হয়ে অতিরিক্ত পরিমাণে খাদ্য খাওয়ানোর ও অনেক সমস্যা রয়েছে। তাই বাচ্চাদের অপুষ্টি দূরীকরণের জন্য দরকার ব্যালান্সড খাবার।

লেখক পরিচিতি : ডা. মানস মহাপাত্র, এমবিবিএস, শ্রমজীবী মানুষের চিকিৎসার উদ্দেশ্যে গড়ে তোলা একটা ক্লিনিকে আংশিক সময়ের চিকিৎসক।

এবিপি আনন্দ-র অ্যাঙ্কর টেলিভিশন সাংবাদিক সন্দীপ্তা চট্টোপাধ্যায় চলে গিয়েছেন ২০১২ সালের ২ ডিসেম্বর, মাত্র ৩৪ বছর বয়সে।

সন্দীপ্তা অন্যের জন্যে ভাবতে ও করতে জানতেন।
মেয়েদের স্বাস্থ্য নিয়ে সচেতনতা বাড়ানোর এক উদ্যোগ

সন্দীপ্তাকে মনে রেখে

মেয়েদের স্বাস্থ্যভুবন

সারোগেসি বা গর্ভদান

(পর্ব : ২)

নৈতিকতা ও আইন

স্বাস্থ্যের বৃত্তে-র বিগত (জুন জুলাই ২০১৪) সংখ্যায় সারোগেসি বা গর্ভদানকারী 'মা', এই ব্যাপারটার মেডিকেল দিক নিয়ে আলোচনায় আমরা জেনেছি, সম্পূর্ণ সারোগেসিতে 'সন্তান পেতে ইচ্ছুক যুগল' বা 'কমিশনিং কাপল' নিজেদের শুক্রাণু ও ডিম্বাণু, অথবা অন্য কোনো পুরুষ/নারীর শুক্রাণু ও ডিম্বাণু, এই দুয়ের মিলনে মানুষের শরীরের বাইরে ভ্রূণ তৈরি করা হয়। তারপর সেই ভ্রূণ সারোগেট 'মা'-এর শরীরে প্রবেশ করানো হয়। সেই সারোগেট 'মা'-এর গর্ভে ভ্রূণ বড়ো হয়ে ওঠে ও সেই 'মা'-ই প্রসব করেন শিশুটাকে। কিন্তু বাচ্চার ওপর আইনি অধিকার থাকে 'কমিশনিং কাপল'-এর। ভারতে 'আংশিক সারোগেসি', যেখানে সারোগেট 'মা'-এর শরীরে অন্য পুরুষের বীর্য কৃত্রিম উপায়ে প্রবেশ করিয়ে সারোগেট 'মা'-এর ডিম্বাণুকে নিষিক্ত করে ভ্রূণ তৈরি হয়— সেটা নিষিদ্ধ। কিন্তু 'কমিশনিং কাপল'-এর আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব ছাড়াও যে কেউ সারোগেট 'মা' হতে পারেন এই দেশে, এবং এ ব্যাপারটা অনেকটাই বাণিজ্যিক লেনদেনের মতো। এতে সারোগেট 'মা'-এর বঞ্চিত ও অপব্যবহৃত হওয়ার সম্ভাবনা থেকেই যায়— লিখছেন

ডা. কাঞ্চন মুখার্জি।

রবার্ট ডি নিরো, কেলসি গ্রামার, সারা জেসিকা পার্কার এবং শাহরুখ খান। সবাই নাম করা সেলিব্রিটি। এছাড়া, আর একটা ব্যাপার এঁদের মধ্যে সাধারণ। এঁরা প্রত্যেকেই অন্তত পক্ষে একটা সন্তানলাভ করেছেন সারোগেসি মারফত। একথা অস্বীকার্য যে সারোগেসি এখন এক বহুল প্রচলিত চিকিৎসা পদ্ধতি। কিন্তু এ ভাবে সন্তান উৎপাদন কি সম্পূর্ণ নৈতিক? আইন কী ভাবে দেখে গোটা বিষয়টাকে? আমরা কি এটাকে মানুষের শরীরকে ঘিরে একটা ব্যবসা হিসাবে দেখব? এটা কি জরায়ু ভাড়া দিয়ে টাকা রোজগারের একটা রাস্তা নাকি সন্তানহীন মানুষদের পিতৃত্ব/মাতৃত্ব দানের এক মহৎ উপায়? সারোগেসি-কে যদি আপনি 'ব্যবসা' বলেন তা হলে এখানে 'উৎপাদিত দ্রব্য' (Final Product)-টা কী? ভাবলে গায়ে কাঁটা দিচ্ছে, এই ব্যবসায়ের কেন্দ্রবিন্দু যদি নারীর জরায়ু হয় তা হলে উৎপাদিত বস্তু (ফাইনাল প্রোডাক্ট) হল একটা মানব শিশু!

সারোগেসি-র পদ্ধতিগত বা বিজ্ঞানভিত্তিক বিষয়গুলো নিয়ে আগের সংখ্যায় আলোচনা করেছি। আমরা জেনেছি আংশিক (Partial) ও সম্পূর্ণ সারোগেসিতে নারীর শরীরে কী ভাবে সন্তান আসে। এবার যদি এর কার্য- নির্বাহের দিকটায় আসি তা হলে আবার দু'টো ভাগ দেখতে পাবো। একটা হল পরোপকারী সারোগেসি (Altruistic Surrogacy), অন্যটা বাণিজ্যিক সারোগেসি (Commercial Surrogacy)। প্রথম পদ্ধতিতে সারোগেট মহিলা এগিয়ে আসেন সন্তানহীন নারী/পুরুষের সাহায্যার্থে। তাঁর চিকিৎসার খরচ কমিশনিং মাতা/পিতা হয়তো বহন করেন, কিন্তু এর মারফত সারোগেট মহিলার অর্থ-উপার্জনের কোনো উদ্দেশ্য থাকে না। বাণিজ্যিক সারোগেসিতে মূল উদ্দেশ্য হল কয়েক মাসের ব্যবধানে কিছু অর্থ উপার্জন। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বাণিজ্যিক সারোগেসি নিষিদ্ধ, যেমন অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, জাপান, নেদারল্যান্ডস, বেলজিয়াম ও ফ্রান্স। ব্রিটিশ যুক্তরাজ্যে (UK) সারোগেট মহিলার চিকিৎসা/পথ্য সংক্রান্ত খরচ মেটানো আইনসম্মত কিন্তু তার চেয়ে বেশি দেওয়া বে-আইনি। আমেরিকায় বিভিন্ন প্রদেশে আইন বিভিন্ন। যেমন— ফ্লোরিডা ও ক্যালিফোর্নিয়ায় সারোগেসি আইনসম্মত হলেও নিউইয়র্কে সারোগেসি বে-আইনি। ভারতে বাণিজ্যিক সারোগেসি আইনি সম্মতি পেয়েছে ২০০২ সালে। আবার জার্মানি, সুইডেন, নরওয়ে এবং ইতালিতে সমস্ত রকমের সারোগেসি বে-আইনি।

চিকিৎসাশাস্ত্রে নৈতিকতার মানদণ্ডে বাণিজ্যিক সারোগেসি : চিকিৎসাশাস্ত্রে নৈতিকতার মূল ভিত্তি (Principles) চারটে। প্রথমটা হল 'ক্ষতি করিও না' (Non-malfeasance বা 'To cause no harm')। দ্বিতীয়টা 'উপকার কর' (Beneficence বা 'To effect a cure')। তারপর 'রোগীর স্বাধীন ইচ্ছাকে সম্মান' (Autonomy বা 'To respect patients independence')। সর্বশেষে 'ন্যায়' বা 'সুবিচার' যার অর্থ 'To treat patients fairly and without discrimination'। এখন এই নীতিগুলো আমরা বাণিজ্যিক সারোগেসির ওপর প্রয়োগ করে দেখব।

চিকিৎসাশাস্ত্রের প্রথম নীতি 'ক্ষতি করিও না' কি সারোগেট 'মা'-এর জন্য মেনে চলা হচ্ছে? ভ্রূণ প্রতিস্থাপনের আগে একজন নারীর শরীরকে প্রস্তুত করতে হয় নানারকম ওষুধপত্র দিয়ে। এগুলোর কোনোটা ঝুঁকিহীন নয়। যদি কোনো বড়সড় পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হয় তা হলে সারোগেট মহিলা কি কাউকে দায়ী করতে পারেন? অর্থের বিনিময়ে একাজ করে থাকলে তো তাঁর অবস্থা আরও খারাপ। সংশ্লিষ্ট চিকিৎসক, কমিশনিং পিতামাতা এবং যদি কোনো দালাল জড়িত থাকেন, তাঁরা সকলেই এক বাক্যে হাত ধুয়ে ফেলবেন। এবার আসি সারোগেট 'মা'-এর মানসিক ক্ষতির কথায়। ন'-দশমাস গর্ভধারণের পর নবজাতকের সঙ্গে হঠাৎ বিচ্ছেদ কি নির্মম হতে পারে না? অর্থের বিনিময়ে আমরা কি সারোগেট মহিলার মাতৃত্বের অধিকার কিনে নিচ্ছি? ভারতীয় আইন অনুযায়ী জন্মের পর সারোগেট 'মা' কোনো ভাবেই সন্তানের অধিকার চাইতে পারেন না। মানসিক ক্ষতির পর আসি সামাজিক ক্ষতির কথায়। রক্ষণশীল সমাজে এখনও সারোগেসিকে 'ভালো চোখে' দেখা হয় না। 'অপ্রাকৃতিক' ও বিবাহ বন্ধনের বাইরে গর্ভধারণের জন্য মেয়েদের অনেক সময় সামাজিক ভাবে চিহ্নিত (stigmatised) হতে হয়। এই ধরনের মানসিক ও সামাজিক ক্ষয়ক্ষতির দায় কার?

চিকিৎসাশাস্ত্রে নৈতিকতার দ্বিতীয় নীতি হল— 'উপকার কর'। সারোগেট মহিলাকে যদি চিকিৎসকের রোগী হিসেবে ধরি এবং কমিশনিং পুরুষ/মহিলাকে 'মক্কেল' (client) হিসেবে ধরি তা হলে চিকিৎসকের প্রাথমিক দায়বদ্ধতা কার প্রতি? একজন দরিদ্র সারোগেট মহিলা হয়তো কিছু অর্থ উপার্জনের মাধ্যমে তাঁর জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন করতে পারলেন। কিন্তু রোগীর আর্থিক শ্রীবৃদ্ধি করিয়ে দেওয়া তো একজন ডাক্তারের কর্তব্য নয়। চিকিৎসক তাঁর শারীরিক আরোগ্য করতে পারলেন কি? সন্তানহীন 'মক্কেলে'র মাতৃত্ব/পিতৃত্ব লাভ হল। এটা কি চিকিৎসাশাস্ত্রের নৈতিকতার মানদণ্ডে 'উপকার করা' তথা 'Beneficience' বলে ধরতে পারি? মনে রাখবেন, চিকিৎসক ওই কমিশনিং কাপল-এর ওপর চিকিৎসা চালান না, বড়জোর তাঁদের শরীর থেকে শুক্রাণু বা ডিম্বাণু সংগ্রহ করেন মাত্র। সেটাও সর্বদা দরকার হয় না, কারণ অন্য পুরুষের শুক্রাণু ও অন্য নারীর ডিম্বাণু নিষিক্ত করে সারোগেট 'মা'-এর শরীরে ভ্রূণ স্থাপন করে শিশু পাওয়া যেতে পারে। অর্থাৎ চিকিৎসক কমিশনিং কাপল-এর ওপর চিকিৎসা করেন না। অপরপক্ষে, সারোগেট 'মা' কিন্তু তাঁর শরীর, তাঁর চিকিৎসার জন্য ওই চিকিৎসকের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। এ এক জটিল পরিস্থিতি। চিকিৎসক যাঁর 'চিকিৎসা' করছেন, তাঁর (সারোগেট মা) ভালোমন্দের চাইতে 'মক্কেল' কমিশনিং পিতামাতার সুবিধা হয়তো-বা চিকিৎসকের কাছে বেশি প্রাধান্য পেতে পারে। কেননা চিকিৎসকের দ্বারস্থ হচ্ছেন কমিশনিং কাপল, এবং তাঁর দক্ষিণা মেটাবেনও কমিশনিং কাপল! হয়তো চিকিৎসক সারোগেট 'মা'-এর ওপর 'উপকার কর' (Beneficience) নীতির পূর্ণ প্রয়োগ করার চেষ্টা করবেন। কিন্তু একটা সন্দেহের অবকাশ কি থেকে যাচ্ছে না?

চিকিৎসাশাস্ত্রে নৈতিকতার তৃতীয় নীতি Autonomy বা রোগীর স্বাধীনতাকে সম্মান জানানো। একজন অত্যন্ত দরিদ্র, স্বল্প শিক্ষিত মহিলা যখন সারোগেসি চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন, তখন তাঁর স্বাধীনতার কথা কতটা মাথায় রাখা হয় জানি না। আমাদের মতো পুরুষতান্ত্রিক সমাজে তাঁর স্বামী বা শ্বশুরবাড়ির লোকজন হয়তো তাঁকে বাধ্য করেন তাঁর জরায়ু ভাড়া দিতে। এই ভাবে উপার্জিত অর্থের অধিকার কি শুধু তাঁর না কি তাঁর স্বামীর? এখানে কি কোনো দালাল জড়িত থাকেন না? অনেক সময় দেখা যায় সংশ্লিষ্ট চিকিৎসাকেন্দ্রই (IVF Clinic) ঠিক করেন কমিশনিং পিতা/মাতা কত টাকা কী ভাবে দেবেন, সেখান থেকে ক্লিনিক কত পাবে এবং সারোগেট 'মা' কত পাবেন। কোনো কোনো ক্লিনিক তো আবার সারোগেট মহিলার সঙ্গে কমিশনিং মাতা/পিতার মোলাকাতই হতে দেন না। কেন? আচ্ছা, যদি দুর্ভাগ্যবশত গর্ভপাত (Miscarriage) হয়ে যায় তা হলে কি সেই দরিদ্র মহিলার অধিকার অর্জনের জন্য কেউ এগিয়ে আসবেন? আরও গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হল, যদি কোনো বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম হয়, তা হলে কি সেই হতভাগ্য সারোগেট 'মা' পুরো

Commercial surrogacy lega
and an industry in India: SC

Dhananjay Mahapatra | TNN

New Delhi: Japanese surrogate baby Manji may have thrown up a huge debate between purists and the needy about the ethicality of surrogacy, but the Supreme Court not only validated "commercial surrogacy" but also termed it a virtual industry in India.

In its judgment in the Manji case on Monday, the apex court allowed the child's biological grandmother to approach the Centre for travel documents to fly back to Japan, but at the same time put its stamp of approval on 'commercial surrogacy'. A Bench comprising Justices Arijit Pasayat and Mukundakam Sharma said

Manji

পারিশ্রমিক পাবেন? কমিশনিং কাপল যদি বিকলাঙ্গ শিশু গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন, তা হলে সেই শিশুর দায়ভার কার? আবার তিনি যদি একটার বদলে যমজ সন্তানের জন্ম দেন তা হলে কি তিনি দ্বিগুণ পুরস্কৃত হবেন? এই পুরস্কার অর্থের পরিমাণ নির্ধারণের স্বাধীনতা কি তাঁর থাকবে? যমজ সন্তান জন্মের পর তিনি যদি একটাকে তাঁর কাছেই রাখতে চান, তা হলে কী হবে? বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সারোগেট মা এমন আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট থেকে আসেন যে তিনি এসমস্ত প্রশ্ন তুলতেই ভয় পান। সিদ্ধান্ত নেওয়ার স্বাধীনতা বা Autonomy এঁদের কাছে অশ্রুত অবোধ্য শব্দমঞ্জরীর বেশি কিছু নয়।

সব শেষে আসি ন্যায় তথা সুবিচারের কথায়। চিকিৎসাশাস্ত্রের নৈতিকতার এই চতুর্থ নীতিটি (Justice) সংজ্ঞায়িত করা ভীষণ কঠিন। বিভিন্ন উন্নত দেশ বাণিজ্যিক সারোগেসির বিরুদ্ধে। তার মূল কারণ এই যে, মানুষের শরীর এখানে পণ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়। সেখানে ভারতে সন্তানহীনতার চিকিৎসার নামে লাগামছাড়া সারোগেসির ব্যবহার কার প্রতি কতটা সুবিচার, সে প্রশ্ন এসেই যায়।

নীতি, আইন ও পয়সার খেলা :

বাণিজ্যিক সারোগেসি নিয়ে যত নৈতিক প্রশ্নই উঠুক না কেন, অস্বীকার করার উপায় নেই ২০০২ সাল থেকে এটা ভারতে আইনসম্মত। ব্রিটিশ যুক্তরাজ্যে বা অন্যান্য উন্নত দেশের তুলনায় এখানে এই পদ্ধতিতে সন্তানলাভে মাত্র এক-তৃতীয়াংশ খরচা হয়। ফলে অনেক বিদেশি নাগরিক আমাদের দেশে আসেন সন্তান লাভের আশায়। মেডিক্যাল টুরিজম-এর এক বড়ো অংশীদার সারোগেসি। শোনা যায় বাৎসরিক ২৫ হাজার কোটি টাকার লেনদেন হয় সারোগেসি মারফত। কিন্তু এত বড়ো বাণিজ্য যথাযথ ভাবে নিয়ন্ত্রণ করার মতো যথেষ্ট আইন কি আমাদের আছে? বোধহয় নেই। এখনও পর্যন্ত আইভিএফ (IVF) কেন্দ্রগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করার মতো কোনো আইন আমাদের নেই। ভারতের মেডিকেল গবেষণার নিয়ন্ত্রক সংস্থা আইসিএমআর (Indian Council for Medical Research) ২০০৮ সালে কিছু নীতি-নির্দেশ (Guidelines) দিয়েছেন এবং ২০০৮ সালে 'চিকিৎসাশাস্ত্রের সাহায্যে জনন প্রযুক্তি (নিয়ন্ত্রণ)' [(Assisted Reproductive Technologies (Regulation)1] নামে একটা 'ড্রাফট বিল' তৈরি হয়েছে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত সেটা আইনে পরিণত হয়নি। প্রত্যেক উন্নত দেশে একটা না একটা নিয়ামক সংস্থা থাকে, যাদের কথা শুনতে সব আইভিএফ ক্লিনিকই বাধ্য থাকে, কিন্তু আমাদের দেশে এরকম কোনো নিয়ামক সংস্থা নেই। ফলে যথেচ্ছাচারের জায়গা থেকেই যায়। ব্যতিক্রমী ডাক্তার বা ক্লিনিক নিশ্চয়ই আছে।

আইসিএমআর তার নির্দেশিকায় বা গাইডলাইন-এ সরাসরি প্রস্তাব করেছে যে 'ART ক্লিনিক (যেখানে সারোগেসি ইত্যাদি করা হয়) শুক্রাণু/ডিম্বাণু দান প্রক্রিয়ায় বা সারোগেসিতে অর্থ বিনিময়ের সঙ্গে কোনো ভাবে জড়িত থাকবে না।' (The ART Clinic must not be a party to any commercial element in donor programme or in gestational surrogacy)। অথচ আমাদের গোটা দেশে ART ক্লিনিকগুলো সারোগেট মহিলা নিযুক্তকরণে (Recruitment) প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে যুক্ত। আবারও বলছি, ব্যতিক্রম নিশ্চয়ই আছে। যেহেতু আমাদের দেশে আইনি রক্ষাকবচ (Safeguard) নেই, সারোগেট মহিলারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আর্থিক চাপের শিকার হতে পারেন। স্বল্প শিক্ষিত, দরিদ্র এবং 'আনস্মার্ট' হওয়ার দরুন তিনি তাঁর অধিকার বা দাবি-দাওয়া সঠিক জায়গায় পেশ করতেও পারেন না। বাণিজ্যিক সারোগেসি বাণিজ্য হিসেবে ভারতে অত্যন্ত দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু তার গুণমান নিয়ন্ত্রণের (Quality Control) জন্য কোনো উপযুক্ত আইনকানুন নেই।

২০০৮ সালে প্রস্তাবিত খসড়া এখনও আইনে পরিণত হয়নি। ফলে সারোগেট মহিলাদের অধিকার রক্ষার দাবি অশ্রুতই থেকে যায়। স্বভাতই আমাদের এখন দরকার 'চিকিৎসাশাস্ত্রের সাহায্যে জনন-প্রযুক্তি' (Assisted Reproduction Technology) সংক্রান্ত এক গুচ্ছ সামগ্রিক আইন প্রণয়ন। সেই আইন স্থির করবে কমিশনিং মাতা / পিতা থেকে শুরু করে সারোগেট মহিলা এবং নবজাতক শিশুর অধিকার। এমনকী ART ক্লিনিকের দায়িত্ব-কর্তব্যও সেই আইনে বিধৃত হওয়া প্রয়োজন। সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতির বিচারে নিরীহ সারোগেট মহিলার স্বার্থরক্ষায় বিশেষ নজর দেওয়া উচিত। এমনকী, সেই মহিলার আইভিএফ চিকিৎসা চলাকালীন বা গর্ভাবস্থায় যদি মৃত্যু হয় (যে ঘটনা খুবই বিরল) সে ক্ষেত্রে কত ক্ষতিপূরণ হওয়া উচিত, সে সব কথাও আইনে লিপিবদ্ধ থাকা উচিত।

ভারতের মেডিকেল গবেষণার নিয়ন্ত্রক সংস্থা আইসিএমআর ২০০৮ সালে কিছু নীতি-নির্দেশ দিয়েছেন এবং ২০০৮ সালে 'চিকিৎসাশাস্ত্রের সাহায্যে জনন প্রযুক্তি (নিয়ন্ত্রণ)১' [(Assisted Reproductive Technologies (Regulation)1] নামে একটা 'ড্রাফট বিল' তৈরি হয়েছে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত সেটা আইনে পরিণত হয়নি। প্রত্যেক উন্নত দেশে একটা না একটা নিয়ামক সংস্থা থাকে, যাদের কথা শুনতে সব আইভিএফ ক্লিনিকই বাধ্য থাকে, কিন্তু আমাদের দেশে এরকম কোনো নিয়ামক সংস্থা নেই।

যে সব শিশু সারোগেসি ইত্যাদি 'অ্যাসিস্টেড রিপ্রোডাকটিভ থেরাপি' (ART)-র ফলে জন্মাল তাদের অধিকার কী কী?

এরকম শিশু স্বাভাবিক ভাবে জন্মানো আর পাঁচটা শিশুর মতোই বাবা-মা ও পারিবারিক অধিকার ভোগ করবে। 'কমিশনিং কাপল'— অর্থাৎ যে পিতামাতা (অন্য সারোগেট 'মা'-এর সাহায্যে) তাকে পৃথিবীতে আনার জন্য চেষ্টা করেছেন, তাঁদের বিবাহ-জাত যে কোনো 'স্বাভাবিক' সন্তানের সমস্ত অধিকার যথা পিতামাতার দ্বারা ভরণপোষণ, উত্তরাধিকার ইত্যাদির অধিকার সেই শিশু পাবে। 'সারোগেসি' চুক্তিতে এটা সাধারণত লেখা থাকে যে শিশু যে রকমই হোক না কেন (বিকলাঙ্গ ইত্যাদি), তার পূর্ণ দায়িত্ব কমিশনিং পিতামাতা নিতে বাধ্য। আমাদের দেশে কিন্তু এই কথাগুলো সারোগেসির চুক্তিপত্রে লেখার আইন বাধ্যবাধকতা নেই— এটা ঠিক নয়। আমার মনে হয় সারোগেসি ব্যাপারটা নিয়ে সামগ্রিক আইন দরকার, তবেই এই সব বিষয়ে স্বচ্ছতা আসবে।

যদি কমিশনিং পিতামাতা ছাড়া অন্য কারও কাছ থেকে ডিম্বাণু বা শুক্রাণু নেওয়া হয়ে থাকে তা হলে ১৮ বছর বয়স হলে সেই শিশুকে তার ডিম্বাণুদাতা 'মা' বা শুক্রাণুদাতা 'বাবা'-র জিনগত তথ্য জানাতে হবে। এর কারণ হল, রোগ ও স্বাস্থ্যের অনেক কিছুই বংশাণু (জিন) দ্বারা প্রভাবিত হয়, তাই সে তথ্য সেই শিশুর কাজে লাগবে।

চিকিৎসাশাস্ত্রে বলা হচ্ছে, 'ডিএনএ'- ফিঙ্গারপ্রিন্টিং[২] যেখানে করা সম্ভব সেখানে ডিম্বাণু/শুক্রাণুদাতা 'মাতা'/'পিতা'-র ডিএনএ ফিঙ্গারপ্রিন্টিং করে রাখতে। এতে সেই 'মাতা' 'পিতা'-র স্বাস্থ্য ও রোগ-সম্ভাবনা বিষয়ক জেনেটিক তথ্য ধরা থাকবে। এটার আইনগত বাধ্যবাধকতা এদেশে নেই, তাই অনেক ART ক্লিনিক এটা করছে না।

কিন্তু ART ক্লিনিকের নৈতিক দায়িত্ব হল, সারোগেট 'মা' এবং কমিশনিং কাপল-কে এটা জানানো যে শিশু প্রাপ্তবয়স্ক (১৮ বছর) হলেই তার ডিম্বাণু/শুক্রাণু দাতা 'মাতা'/'পিতা'-র জেনেটিক তথ্য 'ডিএনএ ফিঙ্গারপ্রিন্টিং' সহ (যদি সেটা একান্ত অসম্ভব না হয়) তাকে জানাতে হবে। অন্যদিকে, ডিম্বাণুদাতা 'মা' বা শুক্রাণুদাতা 'বাবা'— এঁরা যদি কমিশনিং কাপল ব্যতীত অন্য কেউ হন, তাঁদের ব্যক্তি পরিচয় শিশুর কাছে গোপনই থাকবে। সারোগেট 'মা'-এর ব্যক্তিপরিচয়ও গোপন রাখতে হবে।

শেষের কথা

অনেকক্ষণ ন্যায়-নীতি, আইন বা আইনের অভাব ইত্যাদি নানা রকম কচকচি হল। এবার আমি সেই সব প্রশ্নগুলোয় ফিরে আসি যা গত সংখ্যায় তুলে রেখেছিলাম। সারোগেট মহিলা সন্তান প্রসবের জন্য যখন ভর্তি হবেন তখন হাসপাতালে নিজের নাম-ঠিকানা দিয়েই ভর্তি হবেন। ''অমুকের সারোগেট'' হিসেবে তিনি ভর্তি হতে পারেন না। কারণটা হল, কোনো কারণে রোগিণীর মৃত্যু হলে ডেথ সার্টিফিকেটে তো আর 'অমুকের সারোগেট' লেখা সম্ভব নয়! যাক্ গে সে সব অলক্ষুণে কথা! ধরে নিন সব কিছু ঠিকঠাক হয়েছে এবং একটা ফুটফুটে সুন্দর শিশুর জন্ম হয়েছে। শিশুর বার্থ সার্টিফিকেটে মা-বাবা হিসেবে কিন্তু কমিশনিং মাতা-পিতার নামই থাকবে।

সবশেষে আপনাদের কাছে একটা চিন্তার খোরাক পেশ করে ইতি টানব। শোনা যায়, ভারতে কোটি কোটি শিশু অনাথ। সন্তানহীন মাতা/পিতারা তাদের অ্যাডপ্ট/গ্রহণ করতে পারেন না? অনেক ক্ষেত্রে ইচ্ছা থাকলেও তাঁদের উপায় থাকে না। যদি ইচ্ছে না থাকে, তবে তার একটা কারণ হতে পারে যে, দত্তক নেওয়া শিশুর সাথে পিতামাতার কোনো বংশাণুগত (জেনেটিক) সম্পর্ক থাকে না। অথচ অনেকেরই তো জানা যে, দাতা/দাত্রীর শুক্রাণু/ডিম্বাণু নিয়ে যারা সারোগেসি করাতে রাজি হন--- তাতেও তো 'পিতামাতা'র সঙ্গে সারোগেসি-সম্ভূত সন্তানের বংশাণুগত সম্পর্ক থাকে না। আমার মতে, আমাদের দেশের দত্তক নেওয়ার পদ্ধতি বড্ড জটিল। এখানেও অভাব বোধ হয় সামগ্রিক আইনের। 'The Guardian and Wards Act, 1890'-র বলে অভিভাবক হওয়া যায়, 'দত্তক' নেওয়া যায় না। 'The Hindu Adoption and Maintenance Act, 1956'— অনুসারে অ-হিন্দু কেউ 'হিন্দু শিশু'-কে দত্তক নিতে পারেন না। দত্তক আইনের সরলীকরণ হলে বোধহয় সারোগেসি-র প্রয়োজন কমে যাবে।

> আমাদের দেশে আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি যে রকম, তাতে কেবল অ-বাণিজ্যিক 'পরোপকারী' সারোগেসি আইনসম্মত হওয়া উচিত।

বর্তমান নিবন্ধকারের মতে, আমাদের দেশে আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি যে রকম, তাতে কেবল অ-বাণিজ্যিক 'পরোপকারী' সারোগেসি

আইনসম্মত হওয়া উচিত। কেন একথা বলছি? বলছি এই জন্যই যে বর্তমানে 'বন্ধ্যা স্বামী-স্ত্রীর সন্তানলাভের জন্য 'বাণিজ্যিক সারোগেসি' নামে যে ব্যাপারটা চলছে তাতে দরিদ্র, অশিক্ষিত, নিজ-অধিকার সম্পর্কে ওয়াকি-বহাল নন, এমন নারীদের সারোগেট 'মা' হিসাবে বেছে নেওয়া হচ্ছে, এবং তাঁদের নানা ভাবে বঞ্চনা করা হচ্ছে। এটা চিকিৎসাশাস্ত্রে অন্তর্লীন মানবিকতার ধারার একেবারে উল্টো মুখে একটা পদক্ষেপ। শুধু 'বন্ধ্যা যুগল' নন, সন্তান ধারণের ঝক্কি নিতে অনিচ্ছুক মাতা-পিতার পক্ষে দায়ভার অর্থমূল্যে চুকিয়ে দিয়ে সামাজিক ভাবে নীচু তলার নারীর দেহকে ব্যবহার করার অধিকার কতটা মানবিক?

আমাদের এই বৈষম্য ভরা দেশের অবস্থা দু-চারদিনে বদলাবে না — এটাও ঠিক। এমন অবস্থায়, যে সব নারী অসাম্য নির্ভর এক ব্যবস্থায় 'গর্ভ-ভাড়া' দিতে বাধ্য হচ্ছেন, তাঁদের শোষণ আর বঞ্চনা থেকে বাঁচানোর আর কী-ই বা উপায় আছে?

লেখক পরিচিতি : ডা. কাঞ্চন মুখার্জি, এফআরসিওজি, ধাত্রীবিদ্যা ও স্ত্রীরোগ বিদ্যা বিশেষজ্ঞ। প্রাইভেট প্র্যাকটিস করেন।

ধর্ম-জাতপাত-অযুক্তি-কর্তৃত্ব ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে আপনার যুক্তিবাদী মননচর্চার দীর্ঘদিনের সাথী

একুশ শতকের যুক্তিবাদী

একুশ শতকের যুক্তিবাদী

ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির কেন্দ্রীয় মুখপত্র

৩১, প্রাণকৃষ্ণ সাহা লেন, বরানগর, কলকাতা - ৭০০ ০৩৬

যোগাযোগ : ৯৮৩৬৪৭৭১৯৫, ৯৮৩০৬৭৩৫১২

এছাড়া কমবয়সীদের জন্য আছে আকর্ষণীয় গল্প-ফিচার-ছবিতে ঠাসা কিশোর যুক্তিবাদী

If undelivered please return to

Safe International

P-95, Kalindi Housing Estate,
Kolkata - 700089, WB, India,
Ph & Fax - (033) 25223051, 9831908000
Email: safeinternational@gmail.com

নারী নির্যাতন ও জনস্বাস্থ্য সমস্যা

ডা. শর্মিলা মল্লিক

এই বছরই ১০ মার্চ *টাইমস্ অফ ইন্ডিয়া*-য় প্রকাশিত একটা খবর বোধ হয় অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। দেরাদুন শহরে ৩২ বছরের এক যুবক তার স্ত্রীকে দেওয়ালে মাথা ঠুকে খুন করেছে, কারণ খাবারে আলুর তরকারিতে টমেটো দেওয়া ছিল না। মনে প্রশ্ন জাগে, সামান্য এই কারণে মানুষ কি মানুষের জীবন নিতে পারে? দিকে দিকে দেশে দেশে নিরন্তর ঘটে চলা নারী নির্যাতনের ঘটনাগুলো কিন্তু এটাই প্রমাণ করে।

নারী নির্যাতন অথবা নারীর প্রতি হিংসা (Violence against woman) এখন বিভিন্ন গণমাধ্যমে এক বহুল আলোচিত বিষয়। শুধু ভারতে নয়, সারা পৃথিবীতে নারীর প্রতি এই হিংসা যুগ যুগ ধরে বর্তমান। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার এক সমীক্ষা আমাদের জানায় যে সারা পৃথিবীতে প্রায় ৩৫ শতাংশ মহিলা এই হিংসার শিকার এবং বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এর কারণ তার স্বামী বা যৌন সঙ্গী। সমীক্ষা আমাদের আরও জানায় যে প্রায় ৩৮ শতাংশ মহিলার খুনের পিছনেও আছে তাদের স্বামী বা যৌন সঙ্গী।

সমস্যা ও কারণ

২০০৫-০৬ সালে সংঘটিত জাতীয় পরিবার স্বাস্থ্য সমীক্ষা ভারতের নারী নির্যাতনের সমস্যার ওপর কিছুটা আলোকপাত করেছে। এই সমীক্ষা অনুযায়ী প্রতি পাঁচজনে দু'জন বিবাহিত মহিলা তাদের স্বামীদের দ্বারা শারীরিক বা যৌন নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। এর মধ্যে আছে ইচ্ছার বিরুদ্ধে যৌন সংসর্গে লিপ্ত হওয়া, কোনো অস্ত্র দ্বারা আঘাত করা বা ভয় দেখানো এবং বিভিন্ন ধরনের শারীরিক হিংসা, উদাহরণ স্বরূপ চড় মারা, ধাক্কা দেওয়া, লাথি মারা, হাত মুচড়ে দেওয়া, চুল টানা ইত্যাদি ইত্যাদি। ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ড ব্যুরোর দেওয়া পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে যে ২০১৩ সালে ৮৫৪১ জন অপ্রাপ্তবয়স্ক মেয়ে যৌন নির্যাতনের শিকার এবং গত ছ'বছরে এর গতি ঊর্ধ্বমুখী। পরিসংখ্যান আরও দেখায় যে ২০১১ সালে পণের কারণে মৃত্যুর নথিভুক্ত ঘটনা ৮৬১৮। কিন্তু এই সংখ্যা আসলে হিমশৈলের চূড়ামাত্র। অধিকাংশ ঘটনাই লোকলজ্জা, ভয় বা অসহায়তার জন্য প্রকাশিত হয় না। সম্প্রতি শারীরিক বা যৌন নির্যাতনের সঙ্গে আর এক ধরনের নারী নির্যাতন ক্রমশ গুরুত্ব পাচ্ছে, তা হল মানসিক নির্যাতন, যেমন বিরক্ত করা, ভয় দেখানো, অনর্থক দোষারোপ বা লোকচক্ষে হেয় করা। জাতীয় সমীক্ষায় দেখা যায় যে প্রায় ১৬ শতাংশ বিবাহিত মহিলা এই ধরনের মানসিক নির্যাতনের শিকার।

> নারী বহির্জগতে লিঙ্গ বৈষম্যের শিকার হবেই যতক্ষণ না সে নিজের ঘরে সমানাধিকার লাভ করবে।

আসলে নারীর জীবনচক্রের মধ্যে আবর্তিত হচ্ছে এই নির্যাতন বা হিংসার ঘটনাক্রম। শিশুর জন্মের আগে গর্ভাবস্থায় মাকে আঘাত বা মেয়ে শিশুর গর্ভপাত; সন্তানের জন্মের পর মেয়ে শিশুর অবহেলা বা আঘাতজনিত মৃত্যু; শৈশবে বিবাহ বা যৌনকর্মীর বৃত্তি অবলম্বন করতে বাধ্য হওয়া; বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ার পর নারী পাচার, যৌনবৃত্তি, ইচ্ছার বিরুদ্ধে যৌন সংসর্গ, বিবাহ বা সন্তানধারণ করতে বাধ্য হওয়া, পণের জন্য অত্যাচার বা মৃত্যু; বয়স্ক মহিলাদের শারীরিক বা মানসিক নির্যাতন— এ ধরনের উদাহরণ শেষ হওয়ার নয়। নারী বহির্জগতে লিঙ্গ বৈষম্যের শিকার হবেই যতক্ষণ না সে নিজের ঘরে সমানাধিকার লাভ করবে।

এই সমস্যার কারণ প্রোথিত আছে শুধু ভারত নয়, সমগ্র পৃথিবীর ইতিহাস, আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার মধ্যে। ঐতিহাসিকরা মনে করেন, এর মূল শিকড় রয়েছে পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নারীকে সম্পত্তি বলে গণ্য করার মানসিকতার মধ্যে। পৌরাণিক ভারতে অহল্যা, সীতা, দ্রৌপদীও পুরুষ প্রভুত্বের শিকার হয়েছেন। দেবদাসী ও সতী প্রথা, ডাইনি সন্দেহে পুড়িয়ে মারা বা সম্প্রতি খাপ পঞ্চায়েতের বিধানে পরিবারের সম্মান রক্ষার্থে খুন--- নারীর প্রতি হিংসা ভারতের বুকে চলছে যুগ যুগ ধরে। জাতীয় সমীক্ষা দেখাচ্ছে, নারী নির্যাতনের পিছনে দারিদ্র্য, অশিক্ষা ও মাদক বা নেশা দ্রব্যের প্রভাব অপরিসীম। অপেক্ষাকৃত সম্পন্ন পরিবারে এবং স্ত্রী বা দম্পতির দু'জনেই শিক্ষিত হলে নারী নির্যাতনের ঘটনা তুলনামূলক ভাবে কম। কিন্তু ধনী বা বিদেশে বসবাসকারী ভারতীয়দের মধ্যেও এ ঘটনা প্রায়শই শোনা যায়। আধুনিক সময়ে অশ্লীল পোশাক, চলচ্চিত্র, দূরদর্শনের পর্দায় বা ইন্টারনেটে বিকৃত রুচির সাইটগুলোর প্রভাবও উপেক্ষা করা যায় না। আবার

কলকাতার বস্তি এলাকায় করা এক সমীক্ষায় দেখা গেছে পারিবারিক সম্পত্তির অধিকারিণী মহিলাদের নির্যাতিত হওয়ার ঘটনা উল্লেখযোগ্যভাবে কম।

অবহেলা করা যায় না সেই সব তথ্যকে যেখানে দেখা যায় সম্পত্তির অধিকার বজায় রাখার জন্যই হোক বা মহিলার সংখ্যার অপ্রতুলতার জন্য, পাঁচ ভাই এক মহিলাকে বিবাহ করতে বাধ্য হচ্ছে ('Droupadis bloom in Punjab')। পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় যে, জন্মের সময় লিঙ্গ অনুপাত (sex ratio) পাঞ্জাবে ক্রমহ্রাসমান কারণ সেখানে মহিলাদের সম্পত্তির অধিকার বা মহিলাদের কর্মজীবী বলে গণ্য করা সামাজিক ভাবে স্বীকৃত নয়। তাই পণের ভয়ে মেয়ে শিশুর গর্ভপাতের সংখ্যা ভয়াবহ ভাবে বিশাল। বহু দম্পতি অর্থাভাবে আল্ট্রাসোনোগ্রাম বা অবৈধ গর্ভপাতের ব্যবস্থা করতে না পারার জন্য মেয়ে শিশু হত্যার ঘটনাও উদ্বেগজনক ভাবে বাড়ছে আর কমছে শূন্য থেকে ছয় বছরের লিঙ্গ অনুপাত— অর্থাৎ ছেলে শিশুর তুলনায় মেয়ে শিশু সংখ্যা। সম্প্রতি প্রকাশিত এক প্রতিবেদন অনুযায়ী ভারত বর্তমানে এক সামাজিক টাইম বোমার ওপর বসে আছে, কারণ নারী সংখ্যার অপ্রতুলতার জন্য বিপুল সংখ্যক বিবাহযোগ্য পুরুষের অসুরক্ষিত অবৈধ যৌন সংসর্গে লিপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

নারী নির্যাতিত হয় পরিবারের সদস্যের হাতে, আবার নির্যাতিত হয় রাষ্ট্রযন্ত্রের হাতে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপানি সৈন্যদের মনোরঞ্জনের জন্য অধিকৃত এলাকার মেয়েদের আনা হত বেশ্যাপল্লিতে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি সৈন্যদের হাতে শতশত সাধারণ মেয়ে ধর্ষিত হয়েছেন— আট বছরের মেয়ে থেকে পঁচাত্তর বছরের ঠাকুরমা— কেউ রক্ষা পাননি। আবার বসনিয়ায় অধিবাসীদের মানসিক ভাবে দুর্বল করার জন্য ধর্ষণকে ব্যবহার করা হয়েছে যুদ্ধের অস্ত্র হিসেবে।

জনস্বাস্থ্য সমস্যা হিসেবে নারী নির্যাতন সাধারণ চোখে এক সামাজিক ব্যাধি, কিন্তু জনস্বাস্থ্যের ওপর এর তাৎক্ষণিক ও সুদূরপ্রসারী প্রভাব বারবার গবেষকদের সমীক্ষায় প্রতিভাত হয়েছে। শারীরিক ক্ষতির মধ্যে আছে আঘাতজনিত ক্ষত থেকে শুরু হয়ে হাড় ভেঙে যাওয়া, শরীরের অভ্যন্তরে কোনো অঙ্গের আঘাত থেকে মৃত্যু পর্যন্ত। এছাড়াও আছে অবাঞ্ছিত গর্ভধারণ, গর্ভপাত, যৌন রোগ বা HIV সংক্রমণের সম্ভাবনা, নানা স্ত্রী রোগ সংক্রান্ত সমস্যা, পেট ব্যথা, মূত্রনালীর সংক্রমণ, হাঁপানি, হাড় ও পেশির ব্যথা, মাথার যন্ত্রণা, ইরিটেবল বাওয়েল সিনড্রোম ইত্যাদি। মানসিক সমস্যার মধ্যে আছে দুশ্চিন্তা, অবসাদ, খাওয়ার ও ঘুমের সমস্যা, স্বাভাবিক যৌনক্রিয়ার ব্যাত্যয়, আত্মহত্যার প্রবণতা, অবসেসিভ কমপালসিভ ডিসঅর্ডার অথবা পোস্টট্রমাটিক স্ট্রেস ডিসঅর্ডার। সারা পৃথিবী জুড়ে করা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার এক সমীক্ষা জানাচ্ছে যে শারীরিক বা যৌন নির্যাতিত মহিলাদের কম ওজন নিয়ে বাচ্চা জন্মানোর সম্ভাবনা অনির্যাতিত মহিলাদের চেয়ে ১৬ শতাংশ বেশি, অবসাদ বা গর্ভপাত হওয়ার সম্ভাবনা প্রায় দু'গুণ এবং HIV সংক্রমণের সম্ভাবনা প্রায় দেড়গুণ বেশি। ২০০৪ সালের এক সমীক্ষা অনুযায়ী গর্ভাবস্থায় আঘাতের ঘটনা প্রায় ৪ থেকে ৩২ শতাংশ। দুটো উন্নত দেশ (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও গ্রেট ব্রিটেন) যেখানে মাতৃ-মৃত্যুর হার অত্যন্ত কম, সেখানেও গর্ভবতী মায়ের মৃত্যুর এক উল্লেখযোগ্য কারণ হল স্বামী বা যৌন সঙ্গীর নির্যাতন। অ্যাসিড ছোঁড়ার জন্য পুড়ে যাওয়া ও তার ফলশ্রুতি হিসেবে দৈহিক বিকৃতির ঘটনা এত বেশি যে সোনার অলংকার নির্মাতাদের দোকানে অ্যাসিড বিক্রিতেই রাশ টানতে হয়েছে। ইউনিসেফের বিবরণ অনুযায়ী, আফ্রিকা ও মধ্যপ্রাচ্যে প্রায় ১২৫ মিলিয়ন মেয়ে 'ফিমেল জেনিটাল মিউটিলেশন'-এর শিকার, এ এক অদ্ভুত পারিবারিক ঐতিহ্য যার কোনো স্বাস্থ্য সংক্রান্ত উপযোগিতা নেই, ক্ষতি আছে।

এছাড়াও নারী নির্যাতনের সামাজিক ও অর্থনৈতিক কুফলও অস্বীকার করা যায় না। একজন যৌন নির্যাতিত মেয়ে সামাজিক বর্জনের শিকার হচ্ছে, পণ্য হিসেবে গণ্য করে তাঁর পুনরায় যৌন নির্যাতিত হওয়ার সম্ভাবনা উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে। এই ধরনের নারীদের চিকিৎসা, তাঁদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভাবে প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা এবং আইনি লড়াই-এর প্রতিটা পদক্ষেপই যথেষ্ট ব্যয়বহুল এবং যে কোনো দেশের অর্থনীতির ওপর আঘাতস্বরূপ। শুধুমাত্র অর্থনীতি নয়, নারী নির্যাতন আসলে নারীর নৈতিক ও মানবিক অধিকারকেই লংঘন করে।

সমাধান কি আছে?

১৯৯৬ সালে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ঘোষণা অনুযায়ী, নারী নির্যাতন এক জনস্বাস্থ্য সমস্যা হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। ২০০৮ সালে এক প্রচার অভিযানের মধ্য দিয়ে সরকারি, বেসরকারি সংস্থা ও নারীবাদী সংগঠনগুলোকে নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে সরব হওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে। কিন্তু এই সমস্যার সমাধান লুকিয়ে আছে আমাদের আইনি ও আর্থ-সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে। নির্যাতিত নারী জানেন না, কোথায় তাঁর মানসিক বা দৈহিক আশ্রয় বা তাঁদের জন্য কী ধরনের আইনি প্রতিকার আছে। উপরন্তু যৌন নির্যাতনের প্রমাণের দায় আজও তাঁদেরই ওপর বর্তায়। এই প্রসঙ্গে বলা দরকার টু-ফিঙ্গার টেস্ট (যদিও অধুনা নিষিদ্ধ) নারীত্বের প্রতি আরও একটা চূড়ান্ত অবমাননা, যেন পূর্ব যৌন সংসর্গের অভিজ্ঞতা থাকলে সেই নারীকে ধর্ষণ করায় কোনো বাধা নেই। যে সব পারিবারিক আইন নারীর প্রতি বৈষম্য সৃষ্টি করে, সেগুলোর সংশোধন দরকার। নারীর সম্পত্তির অধিকার এখন আইনস্বীকৃত, কিন্তু বহু ক্ষেত্রেই এর প্রয়োগ নেই। এই প্রতিবেদনের লেখিকার কলকাতার বস্তি এলাকায় করা এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, পারিবারিক সম্পত্তির অধিকারিণী মহিলাদের নির্যাতিত হওয়ার ঘটনা উল্লেখযোগ্য ভাবে কম। তাই মহিলাদের অর্থনৈতিক অধিকার ও ক্ষমতায়ন এ ধরনের নির্যাতন কমানোর একটা প্রয়াস হতে পারে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নতুন কর্মপন্থা অনুযায়ী যে সমস্ত কর্মী স্বাস্থ্য পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত, তাদের নারীদের স্বাস্থ্য সমস্যা ও নারী নির্যাতনের মধ্যে যোগাযোগ সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে। যে সব জায়গায় নারীদের পরিষেবা দেওয়ার সুযোগ আছে যেমন গর্ভাবস্থা বা গর্ভপাত বা পরিবার পরিকল্পনার পরামর্শ দেওয়ার সময়, অথবা HIV পরীক্ষার সময়— এই সুযোগগুলোর সদ্ব্যবহার করতে হবে। এছাড়াও, এই সব কর্মীদের আরও সহানুভূতিশীল হওয়া প্রয়োজন। স্বাস্থ্য পরিষেবা, পুলিশ বা আদালতের কৌতূহলী দৃষ্টির সম্মুখীন হয়ে এক যৌন নির্যাতিত মহিলা আরও কতবার নির্যাতিত হন, তার ইয়ত্তা নেই।

মুম্বাইতে সরকারি হাসপাতালে একটি এনজিও (CEHAT) -র সহায়তায় গড়ে ওঠা এক crisis centre (Dilaasa) নিরন্তর প্রচেষ্টা চালাচ্ছে ডাক্তার, নার্স ও সব স্তরের কর্মীদেরই নারী নির্যাতন সম্পর্কে শিক্ষিত করে তুলতে। নিম্ন ও নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়েরা এগিয়ে আসছে এই সেন্টারে সাহায্য নেওয়ার জন্য, কখনও বা কাউন্সেলিং-এর জন্য। মানুষকে, বিশেষত নারীদের সচেতন হতে হবে তাদের প্রতি এই নির্যাতন সম্পর্কে। ইউনিসেফের এক সমীক্ষা অনুযায়ী (২০১২), ভারতে ৫৭ শতাংশ কিশোর ও ৫৩ শতাংশ কিশোরী মনে করে, স্বামীদের তাদের স্ত্রীকে মারার অধিকার আছে।

পরিশেষে এটাই বলার যে নারীকে মানুষ হিসেবে দেখার, নারীত্বকে যথাযোগ্য সম্মান দেওয়ার প্রবণতাই নারী নির্যাতনের অবসান ঘটাতে পারে।

সূ ত্র :

1. WHO. Executive summary : Global and regional estimates of vilence against women : Prevalence and health effects of intimate partner violence and non-partner sexual violence. Available from : http://www.apps.who.int/iris/ bitstream/10665/85241/1/ WHO_RHR_HRP_13.06_ eng.pdf?ua=1.
2. Indian Institute of Population Sciences. National Family Health Survey Report 4. Available from : http://www.hetv.org/india/nfhs/ nfhs3/NFHS-3-Domestic-Violence.pdf.
3. UN Women. Global norms and standards : Ending violence against women. Available from : http://www.en.wikipedia.org/wiki/ Violence_against_women.
4. WHO. Sexual violence. Ch. 6. Available from : http:// www.who.int/violence_injury_prevention/violence/global.../ chap6.pdf.

লেখক পরিচিতি : ডা. শর্মিলা মল্লিক, এমবিবিএস, এমডি, কলকাতার এক সরকারি মেডিকেল কলেজে কম্যুনিটি মেডিসিন বিভাগের অধ্যাপক।

নারীকে মানুষ হতে সুযোগ না দিলে নারী-নির্যাতন চলবেই

যে পরীর ডানা নেই

রাণা আলম

প্রত্যন্ত এলাকায় চাকরি করি। শিক্ষার হার খুব কম। সচেতনতার বালাই নেই। প্রায় শ'তিনেক ছেলে মেয়ে আমার স্কুলে পড়ে। এরা অনেকেই শিশু শ্রমিক। যে কটা ঘর চাকুরিজীবী শিক্ষিত আছেন, তারা এই ছোটোলোকদের সংস্পর্শ এড়িয়ে চলেন।

আপনারা আমার স্কুলের ছেলে-মেয়েদের চেনেন না, নামও জানেন না। তাতে ক্ষতি নেই, খালি মনে করুন এরা মানুষ, তা হলেই হবে। আমার অনেক গল্পের জোগানদার এরাই।

দেবরাজ আর কিরণকে নিয়ে অনেক গল্প আছে আমার। সেই দেবরাজ এখন কারখানার লেবার। মেন্টালি রিটার্টেড ছেলেটা হিসেব জানে না বলে মালিক তাকে প্রায়শই কম মজুরি দেয়।

কিরণ, আমার গল্পের অন্যতম নায়ক। আমাকে বাঘার বিলের ধারে নিয়ে গিয়ে জল ডাইনি-র গল্প শুনিয়েছিল। সে এখন রোগা হাতে গ্যারেজে কাজ করে। দিনে ৫০ টাকা পায়। আমি যখন স্কুল থেকে বাস স্ট্যান্ডের দিকে ফিরি। কিরণ তখন গ্যারেজ থেকে বাড়ি ফেরে। গোটা গায়ে কালিঝুলি মাখা বছর ১২-১৩-র বাচ্চাটা যখন আমার দিকে বড়ো বড়ো চোখে তাকিয়ে হাসে, আমার তখন লজ্জা লাগে। ওর চোখের দিকে তাকাতে পারি না। যে দুস্তর বৈষম্যের শিকার এই বাচ্চাটা, তার অপর প্রান্তে আমি বসে আছি। আমিও তো দায়ী।

আমার গল্পের আরেক চরিত্র হাসমত আলি এখন কলকাতায় রাজমিস্ত্রির জোগানদার হয়ে খাটতে গেছে।

এবার আমি আমার ছাত্রীদের কথা বলছি। আমার মেয়েদের কথা।

চুমকি খাতুন। গত বছর ক্লাস সিক্সে পড়ত। খুব হাসি-খুশি। আচমকা খবর পেলাম যে ওর বিয়ে হয়ে গেছে। ক্লাস সিক্স মানে খুব বেশি হলে ১২ বছর। কী ভাবে বিয়ে হল, তার খোঁজ নিচ্ছিলাম। ওর সহপাঠিনী-রা জানালো চুমকি-র বিয়ে তার বাড়ি থেকেই ঠিক ছিল। চুমকি চেয়েছিল মাধ্যমিক দিয়ে বিয়ে করবে। কিন্তু আত্মীয়-স্বজন আর পাড়া-প্রতিবেশিরা বাড়িতে চাপ দেয় যে মেয়ে বড়ো হয়ে যাচ্ছে। অতএব চুমকিকে বিয়েতে রাজি হতে হয়েছে।

> ক্লাস সেভেনের সীমা একদিন বলেই দিল যে বিয়ে ভাঙানো পাপ।

অর্চনা মাঝি ক্লাস ফাইভে পড়ত। ট্রাক চালকের সঙ্গে বিয়ে হয়েছে। একরত্তি শরীরের একটা মেয়ে। এই খবরটাও বিয়ের পরে পেয়েছি। আটকানোর সময় বা সুযোগ কোনোটাই পাইনি।

প্রথম প্রথম যখন ক্লাসে মেয়েদের কম বয়সে বিয়ের বিরুদ্ধে বোঝাতাম, তখন দেখেছি মেয়েদের মধ্যে একটা কুণ্ঠা কাজ করত। ক্লাস সেভেনের সীমা একদিন বলেই দিল যে বিয়ে ভাঙানো পাপ। স্থানীয় এনজিও কর্মী অর্পিতা ম্যাডাম আর স্কুলের মাস্টারমশাইদের ক্রমাগত চেষ্টাতে সে ছবি অনেকটা পাল্টেছে। সেই কথাই বলব এবার।

উম্মে সালমা। ক্লাস সেভেনের সেকেন্ড গার্ল। অত্যন্ত মেধাবী। খুব বাজি রেখে বলছি, এই মেয়েটা একটু সহযোগিতা পেলে অনেক ওপরে উঠবে। বাবা ট্রাকচালক। বাড়িতে পড়া দেখানোর কেউ নেই। খবর পেলাম, উম্মে'র জন্য নাকি পাত্র খোঁজা হচ্ছে।

ক্লাসের আরেকটা মেয়ে উম্মের খবরটা দিল। উম্মেকে ডেকে পাঠালাম। চঞ্চল শ্যামলা মেয়েটার মুখ নীচু। ক'টা কথার পরেই কেঁদে ফেলল। পাড়া প্রতিবেশিরা না কি এত বড়ো মেয়ে বাড়িতে কেন আছে, বলে কথা তুলছে।

ওর মা'কে ডেকে বোঝানো শুরু হল। শেষ অব্দি মা কথা দিলেন যে এখন মেয়ের বিয়ের কথা ভাববেন না। অবশ্য পরিবারের কথায় বিশ্বাস করে আমি আগেও ঠকেছি। ক্লাস নাইনের সুচরিতা মাঝি। তার মা কথা দিয়েছিলেন যে বিয়ে দেবেন না। তারপর খবর পেলাম যে লুকিয়ে বিয়ে দিয়েছেন। সুচরিতার জলভরা চোখ দু'টো ভুলতে এখনও অনেক সময় লাগবে।

ন্যাশনাল ফিলজফি নামে একটা আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলাম। অনুরোধ করেছিলাম আমার স্কুলের মেয়েদের নিয়ে নারী পাচার আর বাল্য বিবাহের কুফল নিয়ে একটা আলোচনা করতে। যাতে কিছুটা হলেও সচেতনতা বাড়ানো যায়।

ন্যাশনাল ফিলজফি-র সদস্যরা এসেছিলেন। গ্রামের কিছু মহিলা ছিলেন। আর ছিল আমার স্কুলের ক্লাস সিক্স-সেভেন-এইটের মেয়েরা। প্রথমে নারী

পাচার নিয়ে একটা তথ্যচিত্র দেখানো হল। তারপর আলোচক সোমা চ্যাটার্জি বিভিন্ন বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করলেন।

এ ক্ষেত্রে একটা ছোটো কথা বলার আছে। যিনি মূল আলোচক ছিলেন তিনি আদ্যন্ত শহুরে। তাঁর ভাষা অনেক ক্ষেত্রেই প্রত্যন্ত গ্রামের মানুষজনদের কাছে সহজবোধ্য হচ্ছিল না (মূলত একাধিক ইংরেজি শব্দের ব্যবহার)। ওই স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার পক্ষ থেকেই দীর্ঘদিন ওই এলাকায় কাজ করছেন অর্পিতা ম্যাডাম। তাঁকে বলতে দিলেই বোধহয় বেশি ভালো হত।

তিনি সুখিদার বাড়িতে যাবেন। বোঝাবেন, দরকার হলে আইনের সাহায্য নেবেন। সুখিদার বিবর্ণ মুখে কিছুটা হলেও হাসি ফুটলো।

প্রায় দু'ঘণ্টার সেশন হল। আমার মেয়েরা সব মন দিয়ে শুনলো। কেউ কেউ প্রশ্ন করল। ন্যাশনাল ফিলজফি-র সদস্যরা মালদা যাবেন, তাই তাঁদের বিদায় দিলাম।

অফিস ঘরের বাইরে তখন কটা মেয়ের জটলা। তাদের মধ্যে থেকে উম্মে এগিয়ে এল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, কী হয়েছে? উম্মে জানালো যে তার ক্লাসের সুখিদা'র বাড়িতে বিয়ের খোঁজ এসেছে। সুখিদা'র বিয়েতে মত নেই। তবু বাড়ির লোক জোর করছে। সুখিদা বলতে পারছে না। তাই উম্মে নিজেই এগিয়ে বলতে এসেছে।

অর্পিতা ম্যাডাম এগিয়ে এলেন। ঠিক হল, তিনি সুখিদার বাড়িতে যাবেন। বোঝাবেন, দরকার হলে আইনের সাহায্য নেবেন। সুখিদার বিবর্ণ মুখে কিছুটা হলেও হাসি ফুটলো। উম্মে অর্পিতা ম্যাডামের সঙ্গে যাবে বলল।

অফিস ঘরের টেবিল গোছাচ্ছিলাম। জানালা দিয়ে দেখতে পেলাম উম্মে সুখিদাকে নিয়ে বাড়ি ফিরছে। সঙ্গে আরও কটা মেয়ে।

আমি বছর তেরোর অতি চঞ্চল শ্যামলাবরণ দুষ্টু চোখের উম্মেকে দেখতে পাচ্ছিলাম না। সুখিদার পাশে আমি একটা পরীকে দেখছিলাম।

রুপকথার পরীদের ডানা থাকে।

বাস্তবের পরীদের ডানা না থাকলেও চলে। তাই না?

লেখক পরিচিতি : রাণা আলম মুর্শিদাবাদের একটা গ্রামের স্কুলের শিক্ষক।

KLOSTER Pharmaceuticals
B/13/H/3, Braunfeld Road, Kolkata 700 027
Phone : 033 2449-0144, Mob.:98306 63724
E-mail :kloster_pharma@yahoo.co.in
Website : klosterpharma.com

স্লিমিং সেন্টার ও ওবেসিটি

প্রথা বনাম বাস্তবতা

একদিকে দিনরাত বই-কমপিউটার-টিভির সামনে বসে থাকা আর মিষ্টি, ভাজাভুজি, পিৎজা, বার্গার। অন্য দিকে ফিগার জিরো বা ফিজিক হিরো হওয়ার চাপ। মানুষের শরীরটা কেমন হবে, সেটা ঠিক করার দায়িত্ব শেষ অবধি মানুষ বাজারের হাতেই ছেড়ে দেয়। অতএব স্লিমিং সেন্টার— লিখছেন **ডা. অবন্তিকা পাল।**

নবনীতা দত্ত, বয়স ২৩ বছর, সদ্য স্নাতকোত্তর, উচ্চতা ৫ ফুট ২ ইঞ্চি, ওজন ৭৫ কেজি।

জয়রাজ শর্মা, বয়স ৩৬, সফটঅয়্যার কর্মী, উচ্চতা পাঁচ-সাত ও ওজন বিরানব্বই।

এরা উভয়েই শহুরে, স্মার্ট, স্বচ্ছল পরিবারের সন্তান এবং স্থূলতা নিয়ে বেজায় জেরবার। প্রেম হয় না, হলেও কেঁচে যায়। সহপাঠী আর সহকর্মীরা দিবারাত্তির ঠাট্টার নামে ঠেস দিয়ে থাকে। শপিং মলের স্টুয়ার্ডরা ভুরু কুঁচকে জানায়— 'প্লাস সাইজ নেই'। মেট্রো রেলে চারজনের সিটে পাঁচজন বসে অভ্যস্ত যাত্রীরা এদের দেখলে বিরক্তসূচক আওয়াজ বের করে। এ ভাবেই ওরা এক দিন পৌঁছে যায় নগরের একটা ঝিংচ্যাক স্লিমিং সেন্টারে, যাদের ডিসকাউন্টের বিজ্ঞাপন প্রায়ই চোখে পড়ে প্রথম সারির খবর কাগজগুলোর পাতায়।

টিপটপ চিকেন শপ

নবনীতাকে স্লিমিং সেন্টারে যেতে বাধ্য করেছিল তার ভিন রাজ্যের বাসিন্দা এক মাসি। ভদ্রমহিলা বছরান্তে একবার কলকাতায় আসেন ও নবনীতার মাকে গুচ্ছ উপদেশ দিয়ে যান, 'রোগা' না হলে বিয়ে থেকে সন্তান ধারণ জাতীয় বিষয়ে কত রকম সমস্যা দেখা দিতে পারে সে বিষয়ে। এও জানান যে তাঁর মেয়ে এই স্লিমিং সেন্টারে গিয়েই কত 'সুন্দরী' হয়ে উঠেছিল একদা এবং তার দ্রুত বিয়ে হয়ে গিয়েছিল বার্লিন নিবাসী ডাক্তারের সঙ্গে।

জয়রাজ নিজেই তিতিবিরক্ত। শুধু 'অ্যাপিয়ারেন্স'-এর কারণেই চার-চারটে ক্যাম্পাস ইন্টারভিউতে চলে গিয়েছিল বাতিলের খাতায়। ঈষৎ ভেবে রোববার সকালে ফোনটা করেই ফেলে ওরা। না। টেলিফোনে রেট জানানো এদের রেওয়াজ নয়। কারণ কোন্ 'প্যাকেজ' কার জন্য প্রযোজ্য, সেটা 'ক্লায়েন্ট'কে না দেখে বলা সম্ভব হয় না। দ্বিধাগ্রস্ত চিত্তে অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে ওরা পৌঁছে যায় বিকেলবেলায়। একটা জমকালো বাড়ি। বাতানুকূল। তাতে বেশ কয়েকটা কক্ষ। রিসেপশনে সুবেশী এক নারী ও একজন ফিটফাট পুরুষ বলে ওঠে— হাউ ক্যান উই হেল্প ইউ? প্রথমে ওদের বড়সড় ওজন যন্ত্রের ওপর চড়িয়ে দেওয়া হয়। এক থেকে দেড় মিনিট পর প্রিন্টার মারফত বেরিয়ে আসে সরস্বতী পুজোর ফর্দের মতো দেখতে কিছু একটা, যেখানে ওজন ছাড়া অন্য তথ্য ওদের মাথায় বিশেষ ঢোকে না। তারপর অপেক্ষাকৃত সাধারণ (পোশাকে ও কথাবার্তায়) দুই নারী ও পুরুষ আলাদা আলাদা ঘরে নিয়ে গিয়ে এদের শরীরের বিভিন্ন জায়গার মাপ নেন। সেই সব লেখাজোকা সমেত নবনীতা ও জয়রাজকে চালান করে দেওয়া হয় পুষ্টিবিশারদের কাছে। স্বভাবতই এই নিউট্রিশনিস্ট মেয়েটি যুবতী, স্লিম-ট্রিম এবং প্রগলভা। তিনি ওদের শরীরের মাপ, শতকরা ফ্যাটের হিসেব, মানে কত থাকা উচিত ও কত বেশি আছে, বিএমআই, এই সব নিয়ে প্রভূত জ্ঞানদান করেন। শেষমেষ ওরা পুষ্টিবিশারদের দেখানো পথ অনুযায়ী 'প্যাকেজ' নেয়, যেখানে শুধু ওজনই কমবে না, 'ইঞ্চি'তে হ্রাস ঘটবে, উপরন্তু আরও কিছু 'থেরাপি'র মাধ্যমে সংশোধন করে দেওয়া হবে এদের ত্বকের শিথিলতা, মুখের অতিরিক্ত চর্বি, ইত্যাদি প্রভৃতি আরও বিবিধ যা যা নিয়ে ওদের জীবনযাপনে সমস্যা। যদিও এইসব 'চিকিৎসা'র বিশদ বিবরণ সম্পর্কে জানতে চাইলে খুব বেশি কিছু বর্ণনা করা হয় না।

> ওজন কমানো ও ইঞ্চি হ্রাস সম্পর্কে গাঁজাখুরি গপ্পো দিয়ে এদের মনে এমন একটা ধারণা তৈরি করা হয়, যেন দুটো বিষয় পৃথক।

উল্লু বানাওয়িং

১. ওজন কমানো ও ইঞ্চি হ্রাস সম্পর্কে গাঁজাখুরি গপ্পো দিয়ে এদের মনে এমন একটা ধারণা তৈরি করা হয়, যেন দুটো বিষয় পৃথক। যথাযথ শরীরচর্চা করলেই কিন্তু দেখা যায় ওজন ও ইঞ্চি সমানুপাতে কমছে। মানে ৫-৬ কেজি ওজন কমলে খুব স্বাভাবিক ভাবেই দেড় থেকে দুই ইঞ্চি কেমারের মাপ কমবে। অন্তত শারীর বিজ্ঞান তাই বলে।

২. সেলুলাইট। সেটা কী? খায় না মাথায় দেয়? বোঝানো হয়, চামড়ার নীচে জমে থাকা দুষ্টু চর্বি যা ব্যায়াম করলেও কমে না। তার জন্য গছানো হয়

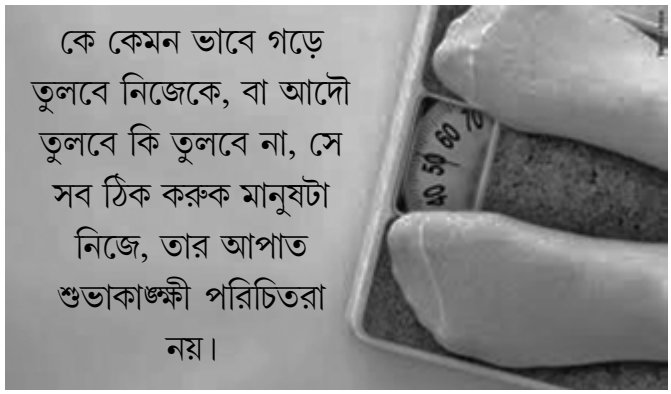

দামি দামি অ্যান্টিসেলুলাইট ক্রিম বা জেল। এসব জেলের বেস তৈরি হয় জলীয় পদার্থ মিশ্রিত ইসবগুলোর ভুসি জাতীয় থকথকে পদার্থ থেকে যার প্রোডাকশন কস্ট ছাপানো দামের কুড়ি ভাগের একভাগ, এমনকী তার চেয়েও কম।

সেলুলাইট শব্দটা আবিষ্কৃত হয় খুব সম্ভবত ১৯২০ সালে। ১৯৬০ সালে *ভোগ* পত্রিকার সৌন্দর্যের ধারণায় এই সেলুলাইটকে কালপ্রিট হিসাবে সাব্যস্ত করে, এবং বলা হয়— তুখোড় সাঁতারু মাছের মতো এই শব্দ অতিক্রম করে ফেলে আটলান্টিক মহাসাগর। আধুনিক প্রগতিশীল বিজ্ঞান সেলুলাইটকে স্রেফ অ্যাডিপোস টিস্যুর বিন্যাস হিসেবেই দেখে, যা বিশেষত শরীরের গঠন অনুযায়ী বদলে বদলে যেতে পারে। সুতরাং 'অরেঞ্জ পিল সিনড্রোম' বা সৌন্দর্যহানিতে সেলুলাইটের ভূমিকা একটা ভ্রান্ত ধারণা বই আর কিচ্ছুটি না, যা বাজারচলতি কোম্পানিগুলোর ফুলে ফেঁপে ওঠায় আরও-আরও ইন্ধন জুগিয়ে চলে।

৩. আরও একটা বোকা বানানোর পদ্ধতির নাম স্পট রিডাকশন। ধরুন, গত তিন মাস যাবৎ দামি সিল্কের ব্লাউজ নবনীতার গায়ে আঁটছে না। কিন্তু পিসতুতো দাদার বিয়েতে পরে যেতে হবে ওইটাই। সুতরাং ঝটিতি ওজন কমানোর প্রচেষ্টা। সেন্টারে যাওয়ার দুই থেকে তিন ঘণ্টার মধ্যে যেন কোনো জল না খাওয়া হয়, জানিয়ে দেয় স্লিমিং সেন্টার। উপরন্তু শরীর থেকে জলীয় পদার্থ বের করে দিয়ে 'ফ্লুইড লস', এমন কি 'মাসল ওয়েসটিং'-ও ঘটানো হয়। ফলে ডিহাইড্রেশন ও ত্বকের শিথিলতা দেখা যায় প্রায়ই। তাৎক্ষণিকতায় যন্ত্র দেখায় কম ওজন, আদতে বাড়ি গিয়ে জল ও খাবার পেটে পড়তেই যে কে সেই।

৪. ক্লায়েন্টকে শোয়ানো হয় একটা লম্বাটে বিছানায়। তারপর মোটা একটা প্যাড দিয়ে বেশ পিঠমোড়া করে বেঁধে দেওয়া হয় পেট বরাবর। সেই প্যাডটা ক্রমে ক্রমে গরম হয়ে ওঠে। বোঝানো হয়, 'ফ্যাট বার্ন' হচ্ছে। চ্যাংড়ামো না কী! যে কোনো প্রকার শারীরিক ক্রিয়কলাপে যা ঘটে থাকে, তা হলো ক্যালরি ক্ষয়। মানে যা খেয়ে নবনীতা আর জয়রাজ ক্যালরি অর্জন করছে, সে বাটি-চচ্চড়ি হোক বা বার্গার (দুটোতে কিন্তু ক্যালরির মাত্রা আলাদা), জোরে হাঁটাহাঁটি, ব্যায়াম, সাঁতার, সাইকেল চালানো, মায় ঘরের ভেতর একা একা ভাংড়া নেচেও সেই অর্জিত ক্যালরি ক্ষয় করা যেতে পারে। কিন্তু গরম প্যাড পরে ফ্যাট পোড়ানো যায় না।

৫. জেনেটিক স্টাডি, মানে মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘাঁ। মুখের ভেতর থেকে 'সোয়াব' বা কোষ নিয়ে (আসলে ছুতো করে পকেট থেকে আরও পয়সা নিয়ে) ডিএনএ টেস্ট করতে পাঠানো হয়। রিপোর্ট হিসেবে যা পাওয়া যা, তা কোনো সচেতন মানুষেরই অজানা নয়— অর্থাৎ ফ্যাট খাবেন না, কার্বোহাইড্রেট এড়িয়ে চলবেন ও প্রোটিন খাবেন বেশি বেশি।

৬. বলা বাহুল্য, এই সমস্ত স্লিমিং সেন্টারের সেরা টার্গেট কিন্তু তরুণ প্রজন্ম। কেননা নবীনতাদের, জয়রাজদের তাড়া থাকে। 'রোগা' হওয়ার তাড়া, চাকরি পাওয়ার তাড়া, বিয়ে করবার তাড়া, বাড়ি গাড়ি ও যাবতীয় পার্থিব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যকে দ্রুত লাভ করার তাড়া, যার মূলে ওই ওবেসিটি-কে কালপ্রিট ঠাওরাতে শেখায় আমাদেরই সমাজ। 'আমাদের' অর্থে কিন্তু শুধু আমাদের দেশের কথা বললাম না। প্রথম বিশ্বেও এই সামাজিক ছবিটায় কোনো ব্যত্যয় ঘটে না তেমন। নারী সৌন্দর্যের সংজ্ঞায় 'ন্যাগ্রোধপরিমণ্ডলা' থেকে 'বার্বিডল'-এর এই যে জার্নি, তা কিন্তু পশ্চিমি সংস্কৃতি থেকেই আমদানিকৃত। না, সমস্যা নেই কোনোটাতেই। তবে কে কেমন ভাবে গড়ে তুলবে নিজেকে, বা আদৌ তুলবে কি তুলবে না, সে সব ঠিক করুক মানুষটা নিজে, তার আপাত শুভাকাঙ্ক্ষী পরিচিতরা নয়।

৭. স্লিমিং সেন্টারের আয়ত্তাধীনে থাকাকালীন একটা কঠিন নিয়ম মেনে চলতে হয়। সকাল আটটায় প্রাতরাশ তো ওই আটটাতেই। এ সময় খেয়াল রাখা হয় না, ব্যক্তিটির পেশার ধরন ঠিক কী রকম। সে আদৌ দফতরে বসে ঠিক দুপুরবেলা চাট্টি কাঁচা ছোলা চিবিয়ে উঠতে পারবে কি পারবে না। তবে মেনে না চললেই বিপদ। 'সেশন' চলাকালীন ওজন বেশি দেখালে সেদিনের প্রোগ্রাম বাতিল ও পয়সা জলাঞ্জলি। মোট কথা কানের গোড়ায় বন্দুক ঠেকিয়ে 'রোগা' করার দুর্বিসহ প্রয়াস। এতে ওজনতো কমে, কিন্তু যেই তিন মাস বা ছ' মাসের প্যাকেজ শেষ হয়, নবনীতারা, জয়রাজরা বাঁধা গোরু ছাড়া পাওয়ার মতো ক্রমে ফিরে যেতে শুরু করে পুরোনো রুটিনে। ফলে আবার ওজন বাড়তে থাকে, কিছুটা অনিয়ন্ত্রিত জীবনযাত্রার দরুন ও বাকিটা তিরিশ হাজার টাকা রসাতলে যাওয়ার শোকে।

৮. পরিশেষে আসি 'ডায়েটিং'-এর কথায়। চিনি খাবেন না, কলা খাবেন না, মাখনের দিকে তাকাবেন না, এসব নানাবিধ ফরমান। অথচ ব্রেন সেলকে পুষ্টি জোগায় পর্যাপ্ত পরিমাণ কার্বহাইড্রেট। আহারে পরিমিত ফ্যাটও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়ক। কোনো কোনো সংস্থা প্যাকেজ গছানোর আগে একবার নিয়মমাফিক জেনে নেয় ব্যক্তিটির শারীরিক অসুস্থতা, কিন্তু সেশন শুরু হলে প্রায় কেউই ক্লায়েন্টের সেই সব অসুবিধা নিয়ে খুব একটা মাথা ঘামায় না। টক জাতীয় ফলে যার অ্যাসিডিটি, তাকে জোর করে গিলতে বলা হয় আপেল। যার কোষ্ঠ নিয়মিত, তাকেও 'প্রোডাক্ট' বিক্রির উদ্দেশ্যে ও দেহ থেকে 'টক্সিন' (!!!) বার করার অজুহাতে জোর করে খাওয়ানো হয় পার্গেটিভ।

ওবেসিটির খুঁটিনাটি

স্থূলতা কাকে বলে তা বুঝতে হলে আগে জানতে হবে বিএমআই। অর্থাৎ বডি মাস ইন্ডেক্স। সহজ বীজগণিত : কেজিতে ওজনকে উচ্চতার মিটার স্কোয়ার দিয়ে ভাগ করলেই মিটে গেল। ইদানীং এসবেরও ঝামেলা নেই। ইন্টারনেট খুলে বিভিন্ন ওয়েবসাইটে ওজন আর উচ্চতা (যে কোনো এককে) বসালেই তারা আঁক কষে দেবে। কার্টুন এঁকে বলে দেবে আপনি শিরিঙ্গে না

২৫ থেকে ২৯.৯ হলে ওভারওয়েট ও সতর্কতা লাগু, আর ৩০ কিম্বা তার ওপরে হলে ওবিজ

কুমড়োপটাশ। ফলাফল তিন ধরনের। ১৮.৫ এর নীচে হলে আপনি রোগা— এমা ছি ছি রোগে ভোগা; ১৮.৫ থেকে ২৪.৯ হলে বিন্দাস; ২৫ থেকে ২৯.৯ হলে ওভারওয়েট ও সতর্কতা লাগু, আর ৩০ কিম্বা তার ওপরে হলে ওবিজ— মানে হাতি তোর গোদা পায়ে লাথি। ৩০-এর ওপরে ওবেসিটির শ্রেণি বিভাজন এই রকম : গ্রেড ১ বা মডারেটলি ওবিজ (৩০-৩৫), গ্রেড ২ বা সিভিয়ারলি ওবিজ (৩৫-এর বেশি থেকে ৪০), গ্রেড ৩ বা ভেরি সিভিয়ারলি ওবিজ (৪০-এর ওপরে)। এই পরিমাপ কেবলমাত্র প্রাপ্তবয়স্কদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। শিশুদের ক্ষেত্রে (১৬ বছর পর্যন্ত) হিসেবের সময় বয়সও মাথায় রাখতে হয়। অধুনা গবেষণায় নতুন নতুন দিক উন্মোচিত হচ্ছে। বিষয়টাকে আরও বিজ্ঞানসম্মত করে তোলার জন্য বিএমআই-প্রাইম গণনা করা চলছে। মেপে নেওয়া হচ্ছে বিভিন্ন পেশির চারপাশের স্কিনফোল্ড। হ্যাঁ, ওবেসিটি অসুখ না হলেও আমাদের চলতি ধারণায় একটা অসুখ তো বটেই। চিকিৎসা বিজ্ঞানে ওবেসিটির কারণে নানান উপসর্গ ও ব্যাধির কথা উল্লেখ করা হয়। বিএমআই বেড়ে গেলে উচ্চ রক্তচাপ বা হাইপারটেনশন, টাইপ-২ ডায়াবেটিস, ডিসলিপিডিমিয়া, স্ট্রোক, করোনারি হার্ট ডিজিজ, গল ব্লাডারের সমস্যা, পলিসিস্টিক ওভারি, এমনকী, ব্রেস্ট বা কোলন ক্যান্সার পর্যন্ত হতে পারে। কিন্তু একজন মানুষ, যার বিএমআই সঠিক, যার মারাত্মক কোনো পারিবারিক ব্যাধি নেই, যে মোটের ওপর নিয়ন্ত্রিত জীবনযাপনই করে, তারও কেন এ ধরনের রোগ হয় সে সদুত্তর, আমাদের দুর্ভাগ্য, চিকিৎসা বিজ্ঞান এখনও দিয়ে উঠতে পারে না। তবু, সাবধানের মার নেই। তাই বাপ-ঠাকুরদার মধুমেহ থাকলে ছেলেপুলের ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখাই ভালো। কারণ, যার কাছে পারিবারিক সূত্রে পাওয়া বাংলো- গাড়ি-বাড়ি কিছুই নেই, তারও জিন আছে। ওবেসিটির পেছনে এই জিনও কিন্তু বেশ বড়ো ভিলেন। পরিবারে অধিকাংশেরই যদি ওজন বেশি থাকে, তবে ছেলেমেয়েরাও অল্প খেলেই মোটা হয়ে যাচ্ছে, দেখা যায়। সে ক্ষেত্রে খাদ্যাভ্যাসে ও শরীরচর্চায় আরেকটু জোর দেওয়া জরুরি। দেশের সরকারি বা আধা-সরকারি স্কুলগুলোতে যদি স্বাস্থ্য সচেতনতা নিয়ে আধ ঘণ্টারও একটা সেশন রাখা রায়, তা হলে ছোটোবেলা থেকেই মানুষ সচেতন হয়ে উঠতে পারে। আর দ্রুততার জগতে খাদ্যাভ্যাস নিয়ে কী-ই বা বলি। পাঁচ টাকায় কাঁঠালি কলা ও কুরকুরে দুইই মেলে। যা সহজলভ্য, চকচকে, বিপণনের দুনিয়ার কদর বেশি তার। নবনীতা জয়রাজদের জীবনেও তাই সেলিব্রেশন মানে পিৎজা হাট।

মনের খবর মন জানে

এ সবের পরেও ওবেসিটির কারণ খুঁড়তে গিয়ে চোখে পড়ে যায় অ্যাংজাইটি আর ডিপ্রেশন, তরুণ প্রজন্ম যার মারাত্মক শিকার। অপ্রাপ্তির বোধের সঙ্গে প্রায় অপরিচিত এই জেন এক্স বা ওয়াই-দের হাতে সেলফোন, কোলে ল্যাপটপ। পকেটে ক্রেডিট কার্ড। প্রযুক্তির আধুনিকীকরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখা মূর্খামি, অবশ্যই, তবে সে সব ব্যবহারেও সংযম রাখা উচিত। ছোটো হয়ে আসা পরিবার ঢাকা পড়ে যাওয়া আকাশ, ক্রমশ বিলুপ্ত সবুজ মাঠ এই প্রজন্মকে স্লিমিং সেন্টার অভিমুখী করে। একটা খোলা ছাদে গিয়ে অনেক তারার নীচে দাঁড়ালে মানুষের মনে যে ব্যপ্তি ঘটে ওঠার সুযোগ থাকে, দশ বাই দশের কুঠুরিতে তার সুযোগ কম। ভালো রেজাল্ট আর ভালো প্রমোশনের ইঁদুর দৌড়ে অবধারিত তাই বাড়তে থাকে উদ্বেগ, গ্রাস করতে থাকে বিষণ্ণতা। আর এ সমস্তই কিন্তু ওবেসিটির মস্ত বড়ো কারণ। 'মন ভালো' করতে দুমদাম খেয়ে ফেলা অস্বাস্থ্যকর খাবার বা অ্যালকোহলও স্থূলতায় কম দায়ী নয়। এমনকী, এগুলো এড়াতে নবনীতারা, জয়রাজরা যে সব ওষুধের শরণাপন্ন হয়, সেগুলোও খিদে বাড়ায়, ফলে ওজন বাড়ে। এক্ষণে পরিত্রাতা হতে পারে 'কগনিটিভ বিহেভোরাল থেরাপি' বা ছোটো কথায় মনোসমীক্ষণ। নিয়মিত কাউন্সেলিং যেমন মুক্তি দিতে পারে অ্যাংজাইটি আর ডিপ্রেশন থেকে, তেমনি খুঁজে বার করে আনতে পারে ওজন বেড়ে যাওয়ার যথাযথ কারণ। একই সঙ্গে প্রণোদিত করতে পারে শরীরচর্চায়, নিয়ে যেতে পারে সঠিক খাদ্যাভ্যাসে। স্লিমিং সেন্টার একজন ক্লায়েন্টের জন্য এতখানি সময়ের অপব্যয় করবে না। কারণ প্রতিটা মুরগি ধরায় তাদের আলাদা আলাদা কমিশন। তাই বরং স্লিমিং সেন্টারের ওপর অযথা নির্ভর না করে আমরাই নিজেদের সচেতনতা বাড়াই।

আসুন কিছু করে দেখাই।

লেখক পরিচিতি : ডা. অবন্তিকা পাল, বিএএমএম, জাতীয় স্বাস্থ্য প্রকল্পে কর্মরত।

শ্রমিক-কৃষক মৈত্রী স্বাস্থ্য কেন্দ্র

এক মডেল যা প্রমাণ করে
কম খরচে আধুনিক চিকিৎসা করা সম্ভবপর।

ক্লিনিক : চেঙ্গাইল-বেলতলা, উলুবেড়িয়া, হাওড়া

সাধারণ চিকিৎসা, শল্যচিকিৎসা, স্ত্রীরোগ, মনোরোগ, চর্মরোগ, দন্তরোগ,
চক্ষুরোগ, ফিজিকাল মেডিসিন, ফিজিওথেরাপি, ডায়াবেটিক ক্লিনিক,
শেখার অসুবিধা আছে এমন শিশুদের ক্লিনিক,
মানস-মন্দিত শিশুদের ক্লিনিক।

কম খরচে

প্যাথোলজি, এক্স-রে, ইসিজি, আল্ট্রাসোনোগ্রাফি, স্পাইরোমেট্রি।

সরকারি হাসপাতালের ন্যায্য মূল্যের ওষুধের দোকানের চেয়েও কম দামে ওষুধের দোকান।

যোগাযোগ : ০৩৩-৬৪৫৩১৮২১, ০৩৩-৩২২১৫৬২৮
ওয়েব সাইট : **ww.shramajibiswasthya.org**

পরিচালনায়
শ্রমজীবী স্বাস্থ্য উদ্যোগ

বার্ধক্যের চিকিৎসা শাস্ত্র-র তাৎপর্য

বয়স্ক মানুষদের শরীর-মনের সমস্যাগুলো কম বয়সী মানুষদের চাইতে আলাদা। তাঁদের রোগগুলো অনেক সময় আলাদা, আবার অনেক সময় একই রোগের ক্ষেত্রেও বয়স্কদের সমস্যা ও চিকিৎসা কম বয়সীদের চাইতে অন্য রকম। সারা বিশ্বের সঙ্গে তাল রেখে ভারতেও বয়স্ক মানুষের সংখ্যা বাড়ছে, আর চিকিৎসক ও সাধারণ মানুষ ক্রমাগত বেশি করে বুঝছেন তাঁদের জন্য বিশেষ চিকিৎসার প্রয়োজনীয়তা—লিখছেন **ডা. অভিজিৎ পাল।**

জেরিয়াট্রিক মেডিসিন (Geriatric Medicine) হল মেডিসিনের সেই শাখা যে শাখা মানুষের বার্ধক্য নিয়ে চর্চা করে ও বয়স্ক মানুষদের সর্ব প্রকারের চিকিৎসা করে। সর্ব প্রকার বলতে বোঝায় প্রতিরোধক, প্রতিষেধক, সামাজিক, মানসিক বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির ওপর নির্ভর করা চিকিৎসা। ভারতে ৬০ বছর ও তার উর্ধ্বে মানুষকে এর আওতায় ধরা হয়। আমেরিকা, গ্রেট ব্রিটেন ও জাপানে বয়সটা ধরা হয় ৬৫ এবং তার উর্ধ্বে। ২০০১-র ভারতে ৬০ বছর এবং তার উর্ধ্বে জনসংখ্যার হার ছিল ৭.৭ শতাংশ। বলা হচ্ছে, ২০৫০ সালে এটা হয়ে যাবে ২৩.৩ শতাংশ। যত দিন যাচ্ছে, ডাক্তাররা বুঝতে পারছেন যে বার্ধক্যের চিকিৎসা বিজ্ঞানে (Geriatric Medicine)-র তাৎপর্য বাড়ছে। ফলে এই শাখাকে নিয়ে ডাক্তারদের ঔৎসুক্যও বাড়ছে। এখানেই প্রশ্ন উঠছে যে মেডিসিন ও জেরিয়াট্রিক মেডিসিনে পার্থক্য কোথায় এবং কেন? একটা কথা বলে রাখা ও বোঝার দরকার আছে। সেটা হল, ageing (বয়স বৃদ্ধি পাওয়া) একটা সাধারণ নিয়মের ব্যাপার। এটা কোনও অসুখ নয়। কিন্তু বয়স্ক মানুষদের অনেক অসুখ অন্য মাত্রায় দেখা যায় ও তার চিকিৎসাও কিছুটা অন্যরকম হয়।

নীচে কিছু আলোচনা করছি, যার থেকে পাঠক ব্যাপারটা সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা করতে পারবেন।

১. বহু সমস্যা আছে যেগুলোকে আমরা বার্ধক্যজনিত সমস্যা বলে থাকি যেমন— চোখের ছানি, হাঁটুর বাত, প্রস্টেটজনিত প্রস্রাবের সমস্যা, কোষ্ঠ কাঠিন্য, ডিমেনশিয়া (dementia) ইত্যাদি।

২. আবার অনেক রোগ আছে যেগুলো বয়স বাড়ার সঙ্গে বাড়তে থাকে বা অন্য রূপ ধারণ করে। যেমন উচ্চ রক্তচাপ, হার্টের অসুখ, C.O.P.D., হাঁপানি ইত্যাদি, মানসিক অবসাদ, ডায়াবেটিস, স্ত্রীরোগ, ক্যানসার (বিভিন্ন ধরনের) ইত্যাদি। এই রোগগুলো যে কোনও বয়সেই হতে পারে কিন্তু বয়স্কদের ক্ষেত্রে অন্য মাত্রায় দেখা দেয়। তাছাড়া বয়স্কদের ক্ষেত্রে এর চিকিৎসাও অন্য রকম বা অন্য মাত্রায় করতে হয়।

বয়সের ভার

বয়স্ক মানুষদের শারীরবৃত্তীয় অনেক পরিবর্তন দেখা যায়, যার প্রতিফলন হয় তাদের শরীরের বিভিন্ন ব্যাধিতে। ডাক্তারদের এই সব ব্যাপারে কিছুটা অন্তত জানতে হয়, না হলে বয়স্কদের চিকিৎসার ব্যাপারে অনেক ফাঁক থেকে যায়। আর সেই জন্য জেরিয়াট্রিক মেডিসিন এখন খুব তাৎপর্যপূর্ণ একটা বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। দু'একটা উদাহরণ দিলে কিছুটা বোঝা যাবে। যেমন ধরুন, মাথা ঘোরা ও শরীরে ব্যালান্সের অর্থাৎ ভারসাম্যের অভাব। হাঁটতে গেলে টলে যাওয়া, বা পড়ে যাওয়ার প্রবণতা। আবার ধরুন হাড় ক্ষয়ে যাওয়া ও নরম ঝুরঝুরে হয়ে যাওয়া। যার ফল অল্প আঘাতেই হাড় ভাঙা (ফ্র্যাকচার), কোমরে ও শিরদাঁড়ায় অসহ্য যন্ত্রণা হওয়া। এই রোগটার (Osteoporosis বা হাড় পাতলা হয়ে যাওয়া) চিকিৎসা খুবই কঠিন। এ-সম্বন্ধে সাধারণ অনেক চিকিৎসকই অবহিত নন। পড়ে যাওয়ার প্রবণতা বয়স্কদের ক্ষেত্রে ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় এবং অনেক ক্ষেত্রেই অবহেলিত। এই রকম আরও অনেক বিষয় আছে যা বয়স্কদের ক্ষেত্রে অন্য মাত্রায় দেখা দেয় এবং কোনটা অসুস্থতা ও কোনটা বার্ধক্যজনিত সাধারণ শারীরিক পরিবর্তন ব্যাপার তা বোঝা অনেক সময় কঠিন হয়ে দাড়ায়।

দুর্বল শরীর-মন নিয়ে বাঁচা

বয়স্কদের আর একটা বড়ো সমস্যা হল Frailty (দৌর্বল্য) অর্থাৎ একজন বয়স্ক মানুষ প্রায় পুরোপুরি অন্যের সাহায্যের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েন। এতই দুর্বল হয়ে পড়ে শরীর ও মন যে নিজের দৈনন্দিন কাজকর্ম করাও কঠিন হয়ে পড়ে। অন্য লোকের সাহায্যের প্রয়োজন হয়। আজকাল এদের বলা হয় দেখভাল করার লোক (Care givers)— সম্পূর্ণ যত্ন করার জন্য, শুধুমাত্র নার্স নয়। বয়স্কদের জীবনে এদের মূল্য অপরিসীম। এদের ট্রেনিং-এর বিশেষ ব্যবস্থাও হওয়া দরকার। আবার মানসিক স্বাস্থ্যের দিকে নজর দিলে দেখা যাবে যে আজকালকার ছোটো ছোটো পরিবারে একাকিত্ব বয়স্ক মানুষদের কুরে কুরে খায়। এর থেকে মানসিক অবসাদ দেখা দেয়, অনেক ক্ষেত্রে আত্মহত্যা করে প্রবীণ মানুষ তাঁর জীবনে ইতি টেনে দেন। যাঁরা জীবনে কোনও অধ্যায়ে যৌথ পরিবারে থেকেছেন তাঁরা বুঝেছেন, আজকালকার ছোটো পরিবারে বয়স্ক মানুষরা কত অবহেলিত।

শেষ কথা

সামাজিক মূল্যবোধ যেখানে পতনের মুখে ও ক্ষয়িষ্ণু, আর্থ-সামাজিক অবস্থা দিন দিন ভয়াবহ আকার ধারণ করছে, সেখানে বয়স্ক মানুষদের কথা ভাববার সময় কোথায়? তাই এ সংগ্রামটা শুধুমাত্র ডাক্তার নার্স বা স্বাস্থ্যকর্মীদের দ্বারাই হবে না— সমাজের সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। মনে রাখতে হবে Charity begins at home--- কাছের মানুষকে দিয়েই মানবিক মূল্যবোধের শুরু হোক।

লেখক পরিচিতি : ডা. অভিজিৎ পাল, এমবিবিএস, এমডি, ট্রপিক্যাল মেডিসিন বিশেষজ্ঞ। প্রাইভেট প্র্যাকটিস করেন। হাওড়ার শ্রমজীবী মানুষের জন্য একটা ক্লিনিকে যুক্ত।

সর্প দংশন

কিছুদিন আগেই আমাদের এক যুবক বন্ধুর অস্বাভাবিক মৃত্যু আমাদের সবাইকে নাড়িয়ে দিয়েছে। তিনি একটা সংগঠনের সদস্য ছিলেন। সেই সংগঠনটা ক্যানিং ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় সাপ ও সাপের কামড় নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে নানা কুসংস্কার কাটিয়ে যুক্তিবাদী চিন্তার প্রসারের চেষ্টায় বহু দিন কাজ করছে। অথচ তিনি গোসাবায় কেউটের কামড়ে মারা যান। ঘটনাটা একদিকে যেমন কষ্ট দেয়, তেমনিই ভাবে উস্কে দেয় বেশ কিছু প্রশ্ন। প্রত্যন্ত এলাকাগুলোতে এখনও সাপের কামড়ের চিকিৎসা কতটা দুর্লভ, একজন সচেতন মানুষও শহর থেকে দূরবর্তী কোনো জায়গাতে কতটা অসুরক্ষিত, চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় এই ঘটনা। তাই সর্প দংশন নিয়ে আবার (এর আগেও স্বাস্থ্যের বৃত্তে-এ এই বিষয় আলোচিত হয়েছে) আলোচনা করছেন **ডা. শেখ মাসুম**।

কিছু পরিসংখ্যান :

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO)-এর ''অবহেলিত গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অসুখসমূহ'' (Neglected tropical diseases বা NTDs)-র তালিকার ১৭টা প্রধান অসুখের মধ্যে সর্প দংশন অন্যতম। অনেকের মতে, এটা এই তালিকার সবচেয়ে ঘাতক অথচ সব চেয়ে অবহেলিত।

সর্প দংশনের অধিকাংশ খবরই সরকারি নথিতে ওঠে না— বিশেষত অনুন্নত দেশগুলোতে যেখানে সর্প দংশনের ঘটনা বেশি ঘটে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা-র মতে, বিশ্বজুড়ে সর্প দংশনের মৃত্যুর সংখ্যা বছরপ্রতি প্রায় ৯৪,০০০ পর্যন্ত হতে পারে।

Public Library of Science (PLOS)-এ American Society of Tropical Medicine & Hygiene-এর সাম্প্রতিক প্রকাশনায় প্রকাশিত তথ্যে তাঁরা পরোক্ষ প্রমাণের সাহায্যে (যেহেতু সরকারি পরিসংখ্যান অসম্পূর্ণ বললেও কম বলা হয়) গণনার মাধ্যমে ভারতের গড় বার্ষিক সর্পাঘাতে মৃত্যুর সংখ্যা নির্ধারণ করেছেন, তাঁদের মতে, ভারতে বছরে আনুমানিক ৪৫,৯০০ মানুষ সর্পাঘাতে মারা যান (সরকারি সূত্রে ২০০০ জন মাত্র!)। লক্ষ্য করুন, এই সংখ্যাটা বিশ্বজোড়া মৃত্যুর হারের প্রায় ৫০ শতাংশের কাছাকাছি।

উপরোক্ত সংখ্যাগুলো দেখলে নিশ্চয়ই নতুন করে বলে দিতে হবে না যে সর্প দংশনে মৃত্যুতে ভারত বিশ্বের ১ম স্থান অধিকার করে (গোটা আফ্রিকা/অস্ট্রেলীয় মহাদেশের চেয়েও যা অনেক বেশি)। উল্লেখযোগ্য যে বিশ্বের ১০টা সবচেয়ে বিষধর সাপের ৫টা পাওয়া যায় অস্ট্রেলীয় মহাদেশে, এবং অস্ট্রেলীয় মহাদেশ একমাত্র মহাদেশ যেখানে বিষধর সাপের সংখ্যা নির্বিষ ও স্বল্প বিষ সাপের চেয়ে বেশি। অথচ সেখানে গত ৭ বছরে মৃত্যুর সংখ্যা ৯টা (২০০৭ সালে ৩টে, ২০০৯-এ ১টা, ২০০১-এ ৩টে, ২০১২-এ ১টা ও ২০১৩-এ ১টা)।

আর মৃত্যুর হারের তুলনামূলক আলোচনায় দেখি— ভারতে বছরে সর্প দংশনের ঘটনা ঘটে ২.৫ লক্ষেরও বেশি, তার মধ্যে ৪৫,৯০০ মৃত্যু ঘটলে মৃত্যুর হার দাঁড়ায় ১৮ শতাংশের একটু বেশি। অন্য দিকে অস্ট্রেলীয় মহাদেশে কামড়ের হার বার্ষিক ৩০০০-এর কাছাকাছি, বার্ষিক মৃত্যুর হার ১-২টি (অর্থাৎ ০.০৫ শতাংশ প্রায়)।

কেন এই দুর্দশা?

ভারতবর্ষে কি বিশ্বের সবচেয়ে মারাত্মক সাপেদের বাস? উত্তর যে 'না', সেটা আমরা আগেই আলোচনা করছি। তা হলে কি ভারতে সাপের বিষের প্রতিষেধক ওষুধের উৎপাদনের অভাব? আশ্চর্য! এই প্রশ্নেরও উত্তর 'না'। প্রতিষেধক বা ANTI-SNAKE VENIN (ASV)-এর উৎপাদনে কিন্তু কোনো ঘাটতি নেই।

সমস্যা প্রধানত দুটো —

১. অশিক্ষা, অজ্ঞতা, কুসংস্কার : সাধারণ মানুষের সাপ সম্পর্কে অজ্ঞতা— সেটা হতে পারে সাপ চেনার বিষয়ে বা সাপের প্রকৃতি, ধর্ম ইত্যাদি বিষয়ে, সাপের কামড় থেকে কী ভাবে বাঁচতে হয় সে বিষয়ে, কামড় একান্তই খেয়ে গেলে মৃত্যুর সম্ভাবনা কতটা বা কতটুকু এবং অকারণে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে প্রয়োজনের থেকে অপ্রয়োজনীয় (বা কখনও ক্ষতিকর) কিছু না করে ঠিক কী করা উচিত, সেই বিষয়ে, অথবা সেই পরিস্থিতিতে আঞ্চলিক নানা প্রথাগত পদ্ধতি বা হিন্দি/বাংলা/অন্যান্য সিনেমায় দেখে শেখা পদ্ধতির কার্যকারিতা ঠিক

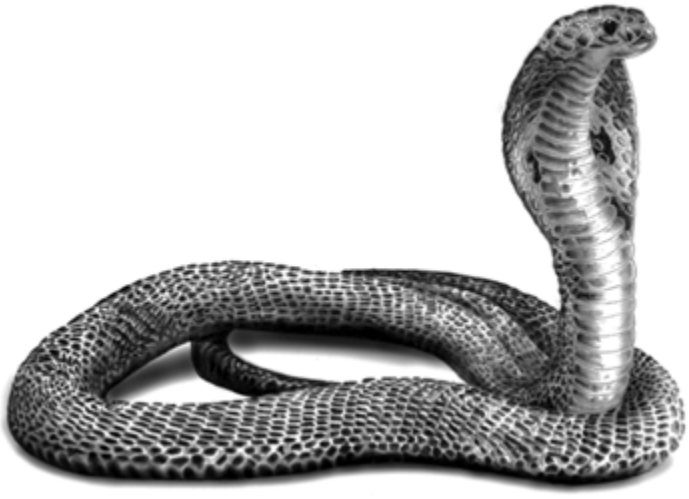

ক্ষতিরই-বা কতটা সেই বিষয়ে। অপরদিকে, আর একদল মানুষ নানান কুসংস্কারে আচ্ছন্ন— তাঁরা ওঝা, গাছ-গাছড়া, বিষ পাথর ইত্যাদির দ্বারস্থ হন। পরে কাজ না হলে হাসপাতালে নিয়ে যান কেউ কেউ। কিন্তু বেশির ভাগ মানুষই জানেনই না যে আধুনিক চিকিৎসার মাধ্যমে সর্পাঘাতে আক্রান্ত মানুষকে বাঁচানো সম্ভব, যদি না দেরি হয়ে গিয়ে থাকে। অথচ মূল্যবান সময় নষ্ট করা হয় নানা আঞ্চলিক পদ্ধতি (Local remedies) বা তুক্‌তাক্‌-এর পিছনে। এই ব্যাপারে জ্ঞান বিতরণ ও সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতার প্রসারে মুখ্য ভূমিকা পালন করতে পারে সরকার— অথচ এই বিষয়ে সরকারেরই নিষ্ক্রিয়তা চোখে পড়ার মতো।

অজ্ঞতা শুধু সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রেই নয়, অজ্ঞতা আছে ডাক্তারের। শহরে বেড়ে ওঠা, শহরে চিকিৎসা শেখা অধিকাংশ ডাক্তারেরই সাপ সম্পর্কে জ্ঞান খুবই সীমিত, ডাক্তারি পাঠক্রমেও সাপের কামড়ের চিকিৎসা তার প্রাপ্য গুরুত্ব পায় না। তারা এমন অনেক রোগের চিকিৎসা শেখে, সে রোগের রোগী হয়তো সারা জীবনে একটাও তারা পাবে না। কিন্তু ভাল ভাবে শেখানো হয় না সাপের কামড়, জলাতঙ্ক, মৌমাছি-বোলতা-বিছের হুলের চিকিৎসা। আসলে মূলত গ্রামীণ প্রান্তিক মানুষের স্বাস্থ্য সমস্যা বলেই বোধহয় এগুলো যথাযথ গুরুত্ব পায় না রাষ্ট্রের কাছে। অন্যদিকে, ঔপনিবেশিক শিক্ষা ব্যবস্থার 'ঐতিহ্যে' দেশীয় রোগ অবহেলিত থাকারই কথা।

২. **স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানের ব্যবস্থায় গলদ** (Ineffective Health-care delivery system) : প্রতি ১০টা সর্পাঘাতের ৯টা হয় গ্রামাঞ্চলে। অথচ দেশের প্রত্যন্ত এলাকাগুলোতে স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার কোনো ব্যবস্থা ভালো ভাবে গড়ে ওঠেনি। কলকাতার প্রতিটা মেডিক্যাল কলেজ/হাসপাতালে সাপের কামড়ের প্রতিষেধক রয়েছে কিন্তু কলকাতায় ক'জনকে আর সাপে কামড়ায়? প্রত্যন্ত এলাকায়, যেখানে সর্পাঘাত বেশি হয়, তার দূরদূরান্ত পর্যন্ত কোনো স্বাস্থ্যকেন্দ্র থাকে না। যে সময়ে (সন্ধ্যায়/রাত্রে) সর্পাঘাত বেশি হয়, সেই সময়ে সবচেয়ে নিকটবর্তী হাসপাতাল বা স্বাস্থ্যকেন্দ্র বা ডাক্তারখানায় পৌঁছানোর মতো কোনো যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রায়ই থাকে না। ফলে আক্রান্ত ব্যক্তি বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ইচ্ছা থাকলেও হাসপাতাল পর্যন্ত পৌঁছোতে পারে না বা অনেক দেরিতে পৌঁছোয়। ফলে ভাবতেই হয় যে ওষুধ/প্রতিষেধক/ডাক্তার/সামগ্রী থেকেও যদি মানুষ অবধি পরিষেবাটা পৌঁছোলই না, তা হলে লাভ কী হল! সাপের কামড়ে বিশাল উন্নতমানের চিকিৎসা লাগে না— 'ভেন্টিলেটর'' বা 'ডায়ালিসিস'-এর দরকার খুব কম ক্ষেত্রেই হয় এবং তাও দরকার হয় চিকিৎসা শুরু হতে দেরি হওয়ার কারণে। ঠিক সময়ে চিকিৎসা হলে খুব সামান্য কিছু জিনিস থাকলেই একদম প্রাথমিক স্তরেই চিকিৎসা করা যায়। কিন্তু আমাদের দেশে প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবার স্তরটাই সবচেয়ে দুর্বল— এই স্তরটাকে সার্বিক ভাবে শক্তিশালী না করলে শুধু সর্পাঘাত কেন, কোনো প্রকার চিকিৎসাই আপামর জনসাধারণের কাছে পৌঁছাবে না, তা মুষ্টিমেয় কিছু মানুষের হাতেই কুক্ষিগত থাকবে।

তা হলে উপায়?

১. **সাপ চিনুন :** সাপ সম্পর্কে ন্যূনতম জ্ঞান থাকা ভালো। কোন্ সাপ বিষধর, কোন্‌টা নির্বিষ, সাপেদের প্রকৃতি, ধর্ম, পছন্দ/অপছন্দ ইত্যাদি জানা থাকলে পথ চলতে সুবিধাই হবে— এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা পরের সংখ্যায় হবে।

২. **সতর্ক থাকুন :** 'Prevention is better than cure' এই প্রবাদটা আমাদের খুবই পরিচিত। তাই সর্পাঘাত যাতে না ঘটে তাই হওয়া উচিত আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য। সাপের কামড় ঠেকাতে—

ক. রাত্রে মজবুত জুতো পরে চলাফেরা করুন। সঙ্গে টর্চ রাখুন (এবং সেটা ব্যবহার করুন!)। ভারী কদম ফেলে হাঁটুন, সাপ কম্পন বুঝতে পারে, বুঝে সরে যাবে।

খ. ঘাসকাটা, ফল বা তরিতরকারি তোলা, গাছের নীচে পরিষ্কার করার সময় সঙ্গে একটা লাঠি রাখুন। আগে লাঠি দিয়ে ঘাস বা পাতা নাড়ান। সাপ থেকে থাকলে তাকে চলে যাওয়ার সুযোগ দিন। আগে কেটে রাখা ঘাস বা খড় তোলার আগে লাঠি দিয়ে নাড়িয়ে দেখে নিন।

গ. শস্য কাটার সময় আগে তলার জমিটা দেখে নিন।

ঘ. কাঠ কুড়নোর সময় পাতা ও কাঠিগুলোর দিকে নজর রাখুন।

ঙ. পশু-খাদ্য ও জঞ্জাল বাড়ির কাছে রাখবেন না। এগুলোতে ইঁদুর আসে, আর ইঁদুরের লোভে আসে সাপ।

চ. মাটিতে না শোওয়াই ভাল।

ছ. ঘরের দরজাজানালার কাছে গাছপালা লাগাবেন না— গাছ বেয়ে সাপ ঘরে ঢুকতে পারে।

৩. **সাপের কামড়ে কী করণীয় তা জানুন —** মনে রাখুন— 'Do it R.I.GH.T.'

ক. R– Reassure— রোগীকে সাহস জোগান— বলুন সব সাপের

কামড়ের মধ্যে ৭০ শতাংশ নির্বিষ সাপের কামড়, আর বিষধর সাপ কামড়ালেও তা মাত্র ৫০ শতাংশ ক্ষেত্রে বিষ ঢালে।

খ. I– Immobilise : কামড়ানোর জায়গাটা এমন ভাবে অনড় করুন যে ভাবে করা হয় হাড় ভাঙলে। প্রয়োজনে স্প্লিন্টের ব্যবহার করা যেতে পারে, কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে যাতে স্প্লিন্ট বাঁধতে গিয়ে কোনো ভাবেই রক্ত সঞ্চালন যেন বন্ধ না হয়ে যায় (দড়ি দিয়ে কষে বাঁধবেন না, ব্যান্ডেজ/চওড়া কাপড় বাঁধার কাজে ব্যবহার করুন)। পায়ে/হাতে কামড়ালে সেই অঙ্গটা হৃদপিণ্ডের থেকে একটু নীচু তলে রাখলে ভালো।

গ. GH– Get to the Hospital immediately : যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হাসপাতালে নিয়ে যান। দেরি করবেন না, মনে রাখবেন— সাপের বিষে যদি বিষক্রিয়া হয়, তার চিকিৎসা হচ্ছে প্রতিষেধক, প্রতিষেধক এবং একমাত্র প্রতিষেধক।

ঘ. T–Tell doctor about any symptom during transit : যাওয়ার পথে রোগীর যে যে উপসর্গ লক্ষণ দেখেছেন তা ডাক্তারকে বলুন।

সাপটাকে যদি মেরে ফেলা হয়ে থাকে, মৃত সাপটাকে হাসপাতালে নিয়ে যান শনাক্তকরণের জন্য। কিন্তু সাপটাকে ধরার/মারার জন্য আলাদা করে সময় নষ্ট করবেন না— এতে দেরি হয়, এবং আরও অন্যান্য মানুষের আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বাড়ে।

আরও দরকার জানা কী কী করবেন না। যে যে জিনিসগুলো করার প্রলোভনকে আটকাতে হবে সেগুলো হল—

ক. দড়ি দিয়ে কামড়ের জায়গা বা তার ওপরে বাঁধন দেবেন না।

খ. কামড়ানোর জায়গাটা কেটে বিষ বা 'বদ রক্ত' বার করে দেওয়া বা মুখে করে শুষে বিষ বা 'বদ রক্ত' বার করার চেষ্টা করবেন না।

গ. কামড়ের জায়গাটা পুড়িয়ে দেওয়া/বৈদ্যুতিক শক দেওয়া/বরফ দেওয়া/অ্যাসিড দেওয়া যাবে না।

ঘ. কামড়ের জায়গায় প্রতিষেধক ওষুধ দেবেন না।

ঙ. লংকা, আদার রস, শেকড়-বাকড় লাগানো/খাওয়ানোর কোনো যুক্তি নেই, যুক্তি নেই বিষ পাথর, ওঝার মন্ত্র/ঝাড়ফুঁকের বা ছোটো মুরগীর মলদ্বার কেটে লাগানোর রীতির।

চ. এমনকী জল বা সাবান দিয়ে কামড়ের জায়গাটা ধোয়াও যাবে না।

উপরোক্ত পদ্ধতিগুলোতে লাভ তো হয়ই না, ক্ষতির সম্ভাবনাই বেশি, তাছাড়া মূল্যবান সময় নষ্ট হয় এর পিছনে।

একটা ব্যতিক্রমী পরিস্থিতি :

প্রশ্ন : আমি খবর পেলাম আমার এক বন্ধুর পায়ে চন্দ্রবোড়া কামড়েছে। খবর পেয়ে দৌড়ে তার বাড়িতে যাই, গিয়ে দেখি তার অবস্থা খুব একটা ভালো নয়, বাড়ির লোক বেগতিক দেখে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার তোড়জোড় করছে। এদিকে কামড়ের জায়গাটার ওপরে টান করে দড়ি বাঁধা রয়েছে (আগেই কেউ বেঁধে দিয়েছে)। প্রায় ২-৩ ঘণ্টা হয়ে গিয়েছে কামড়ের পর, পা-টা নীলচে-কালচে হয়ে গেছে। তা হলে কি বাঁধনটা খুলে দেব সঙ্গে সঙ্গে?

উত্তর : না। বাঁধনটা দেওয়া উচিত হয়নি, কিন্তু একবার বাঁধন দেওয়া হয়ে গেছে ও বেশ কিছুটা সময় রক্ত চলাচল বন্ধ অবস্থায় কেটে গেছে। এবার হঠাৎ বাঁধন খুললে এক সঙ্গে অনেকটা বিষ মুহূর্তের মধ্যে পা থেকে বাকি শরীরে ছড়িয়ে পড়ে অবস্থার আরও অবনতি ঘটাবে— মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। হাসপাতাল পরিকাঠামো ছাড়া এই জটিলতার মোকাবিলা সম্ভব নয়। ফলে উচিত কাজ হচ্ছে বাড়ির লোককে দ্রুত হাসপাতাল নিয়ে যেতে উৎসাহ দেওয়া। সেখানে পায়ের বাঁধনের ওপরে রক্তচাপ মাপার "কাফ্" (cuff) বেঁধে, সেটা স্ফীত করে তারপর বাঁধনটা খুলতে হবে ও তারপর আস্তে আস্তে 'কাফ'-এর হাওয়া খুলে দিতে হবে যাতে পায়ে রক্ত চলাচল ধীরে ধীরে ফেরে (এক দমকে নয়)।

৪. সরকারের কাছে দাবি তুলুন :

ক. জনসাধারণকে সচেতন করতে সক্রিয় ভূমিকা নিক সরকার, বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমের সাহায্যে মানুষের কাছে সঠিক বার্তা পৌঁছে দিতে উদ্যোগী হোক।

খ. স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছোয় যেন প্রাথমিক স্তরে— সেই খেয়াল রাখতে হবে। প্রত্যন্ত এলাকায় স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ঘনত্ব বাড়াতে হবে এবং সর্বোপরি, কেন্দ্রগুলো যেন সক্রিয় থাকে সেই খেয়াল রাখতে হবে। স্বাস্থ্যকেন্দ্র তালাবন্ধ পড়ে থাকলে কি লাভ?

গ. প্রতিটা সরকারি হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যেন সাপের বিষের প্রতিষেধক (ASV) ও আনুষঙ্গিক ওষুধ ও সামগ্রী মজুত থাকে।

ঘ. ডাক্তারি পাঠক্রমে যেন সর্প দংশনের মতো প্রান্তিক মানুষদের স্বাস্থ্য সমস্যাগুলো গুরুত্ব পায়, ডাক্তার সাপের কামড়ের চিকিৎসা করতে পারেন না— এমনটা যেন না হয়।

(সাপ, সাপের বিষ ও বিষক্রিয়ার লক্ষণ ইত্যাদি নিয়ে সবিস্তারে আলোচনা পরের সংখ্যায়।)

লেখক পরিচিতি : ডা. শেখ মাসুম, এমবিবিএস। শ্রমজীবী মানুষের জন্য তৈরি একটা ক্লিনিকে চিকিৎসা করেন।

ত্বকে পদ্মকাঁটা

রোগীরা এসেই বলেন, ডাক্তারবাবু, আমার হাতের উপর পদ্মকাঁটা হয়েছে। শুনে চটুল এক বাংলা গানের কলিটা শুনিয়ে দিতে ইচ্ছে করে, "... কাঁটা অনেক রকম...''। সত্যিই তাই, ত্বকে কাঁটা-কাঁটা যা হাতে পড়ে তা সবই এক জিনিস নয়, এক রোগের লক্ষণ নয়— জানাচ্ছেন **ডা. শর্মিষ্ঠা দাস।**

কুলকাঁটা, গোলাপকাঁটা, বেলকাঁটা—সবরকম গাছের কাঁটা গঠনগত ভাবে আলাদা— এটা উদ্ভিদ বিদ্যার বিষয়।

ত্বকে 'পদ্মকাঁটা' নামটা বাংলার মানুষের লোকমুখে খুবই প্রচলিত। রোগীরাই অনেক সময় এসে বলেন— ''এই দেখুন না— পদ্মকাঁটার মতো কী সব হয়েছে...।'' এ কিন্তু ভূতের গল্পে শুনে বা ঠান্ডায় গায়ে কাঁটা দেওয়া নয়। যে লোক-চিকিৎসকরা 'পদ্মকাঁটা' নামটা চালু করেছিলেন তাঁরা ত্বকের এই রোগের সঙ্গে পদ্মকাঁটার সাদৃশ্যটা খুব সুন্দরভাবে মিলিয়ে ছিলেন। কারণ, পদ্মফুলের ডাঁটাতে হাত বোলালে যে অনুভূতি হয় ত্বকের এই সমস্যাতেও ঠিক সেরকমটাই দেখা যায় — বিঁধে যাওয়ার মতো তীক্ষ্ণতা নেই কিন্তু হাতে একটু কাঁটা কাঁটা ভাব লাগে।

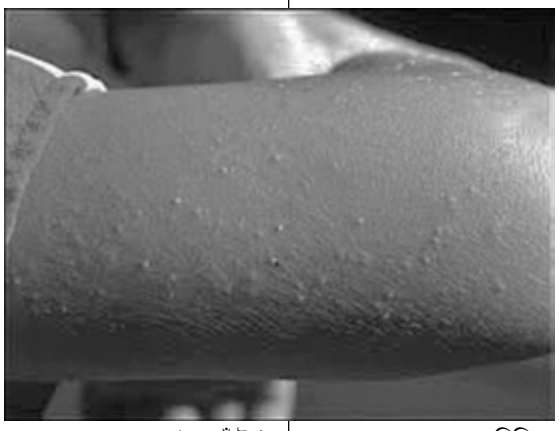

ত্বকে পদ্মকাঁটার মতো ফুসকুড়ি আসলে একটা লক্ষণ— বেশ কয়েকটা চর্মরোগে এই লক্ষণ দেখা যায়। 'পদ্মকাঁটা' ব্যাপারটা আসলে কী? প্রত্যেকটা লোমকূপের মুখে কেরাটিন থাকে। রোগ ও শারীরবৃত্তীয় কারণে কখনও কখনও কেরাটিন স্তরটা বেড়ে যায় ও বেশি বেশি কেরাটিন জমে লোমকূপের মুখটা উঁচু হয়ে যায়। এই স্তূপীকৃত কেরাটিন যুক্ত উঁচু উঁচু দেখতে লোমকূপগুলোই পদ্মকাঁটা। এই বাংলার 'পদ্মকাঁটা' ব্যাপারটা যেইমাত্র চিকিৎসা বিজ্ঞানের পরিভাষায় ফলিকুলার কেরাটোসিস (Follicular Keratosis) হয়ে গেল, অমনি হাত ধরাধরি করে এসে যায় অনেকগুলো চর্মরোগের কথা।

কোথায় 'পদ্মকাঁটা' দেখতে পাবেন?

প্রথমেই আশ্বস্ত করা ভাল যে 'পদ্মকাঁটা' ব্যপারটা কখনওই খুব ভয়ের বা মারাত্মক কিছু ব্যাপার নয়। অনেক চর্মরোগেই ত্বকে অতিরিক্ত শুষ্কতা দেখা যায়। যেমন শিশুদের অ্যাটোপিক ডার্মাটাইটিস, মীনচর্ম বা ইকথিওসিস— এই সব রোগে শরীরের বিভিন্ন জায়গায় পুঞ্জীভূত পদ্মকাঁটার লক্ষণ থাকে। একে বলে কেরাটোসিস পাইলারিস (Keratosis Pilaris)। কোনও কারণ ছাড়াও কমবয়সী ছেলেমেয়েদের প্রায়ই পদ্মকাঁটা দেখা যায়— বিশেষ করে উপর হাতে বাইরের দিকে, পশ্চাৎদেশে। অনেক সময় কোনও চিকিৎসা ছাড়াই সেরে যায়। পদ্মকাঁটা আবার কখনও এক জায়গায় পুঞ্জীভূত না হয় আলাদা আলাদা ভাবে বেশ খানিকটা জায়গা জুড়ে ছড়িয়ে থাকে। লাইকেন নিডিটাস (Lichen Niditus) নামে একধরনের চর্মরোগে এরকম পদ্মকাঁটা দেখা যায়। কমবয়সী ছেলেদের লিঙ্গে, বগলের কাছে, হাতে এই সব জায়গায় এই কাঁটার মত ফুসকুড়ি থাকে। লাইকেন প্লেনাস (Lichen Planus) নামে এক চর্মরোগ আছে যা খুব বিরল নয়। এতে সাধারণত মাথাটা চ্যাপ্টা ধরনের ফুসকুড়ি হয়, কিন্তু একটা বিশেষ ধরনের লাইকেন প্লেনাসে পদ্মকাঁটার মতো ফুসকুড়ি দেখা যায়। ভিটামিন-এ এর অভাব-জনিত ত্বকের সমস্যা, ডেরিয়ার'স ডিজিস (Darier's disease) নামে এক বিরল চর্মরোগেও পদ্মকাঁটা দেখা যায়।

সুতরাং এক পদ্মকাঁটারও আবার অসুখের ক্ষেত্রে কত রকমের রকমফের।

চিকিৎসা : 'পদ্মকাঁটা' ব্যাপারটা চর্মরোগের পর্যায়ে চলে এলে অর্থাৎ বেশ জাঁকিয়ে বসলে যাতে রোগীর অসুবিধা হচ্ছে, চুলকোচ্ছে— তখন চিকিৎসা তো করতেই হয়। সাধারণত শুষ্ক ত্বকের জন্য যে পদ্মকাঁটা হয় তা ভালভাবে নারকেল তেল, ত্বক আর্দ্র রাখার ক্রিম নিয়মিত মাখলেই চলে যায়। রোগের তীব্রতা তার থেকে বেশি হলে হাল্কা ল্যাকটিক অ্যাসিড ও স্যালিসিলিক অ্যাসিডযুক্ত মলম দেওয়া হয়— বেশ ভাল কাজ করে। যদি ভিটামিন-এ এর অভাবজনিত কারণ থাকে তাহলে ডিম, গাজর, পাকা পেঁপে ইত্যাদির সঙ্গে ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল / শিশুদের ভিটামিন 'এ' তেল খেতে হবে।

লাইকেন প্লেনাস-এর পদ্মকাঁটা যদি স্টেরয়েড মলমেও না সারে তাহলে স্টেরয়েড বড়ি খেতে হয় অনেক সময়। এ সব কোনও কিছুতেই কাজ না হলে কিছু কিছু ক্ষেত্রে ভিটামিন 'এ' জাতীয় রেটিনয়েড জাত যৌগ আইসোট্রেটিন ট্যাবলেট খেতে দেওয়া হয়। এই ট্যাবলেট আবার গর্ভাবস্থায় এবং গর্ভের সম্ভাবনা আছে, এরকম অবস্থাতেও একেবারেই নিষিদ্ধ। সেটা ডাক্তার সব দিক বিবেচনা করেই পরামর্শ দেবেন। নিজে নিজে এই ওষুধ কখনই খাবেন না।

এই প্রসঙ্গে আর একটু অন্য কথা বলে নিই— অনেকের ছোবড়া দিয়ে খুব বেশি রগড়ে চান করার অভ্যেস আছে, অনেক মহিলা আবার লোম তোলার জন্য মোমের প্রলেপ (waxing) ব্যবহার করেন— এই সব কারণেও ঠিক পদ্মকাঁটা না হলেও লোমকূপগুলো বেশি প্রকট হয়ে দেখতে খারাপ লাগে। এ সব করার থেকে বিরত থাকাই ভালো।

লেখক পরিচিতি : ডা. শর্মিষ্ঠা দাস, এমবিবিএস, ডিভিডি। একটা সরকারি হাসপাতালে চর্মরোগ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসক।

অ-স্বাভাবিকতার সন্ধান

রুমঝুম ভট্টাচার্য

বৃহত্তর সমাজ গোষ্ঠীর ক্ষুদ্রতম একক হল মানুষ। একজন ব্যক্তি মানুষ কী ভাবেন, কি ভাবে কথা বলেন, কী কী ধরনের আচরণ করেন তার সামান্যকরণের (Generalisation) একটা মাপকাঠি (normal range) তৈরি করা হয়েছে। অবশ্যই সেই মাপকাঠি সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল (cultural background) অনুযায়ী বদলে যায়। তা সত্ত্বেও মোটা দাগের একটা মাপকাঠি গোটা বিশ্ব জুড়ে একই থাকে। যার ভিত্তিতে, বা যার সঙ্গে তুলনা করে আমরা ব্যক্তি মানুষটাকে স্বাভাবিক বা অস্বাভাবিক আচরণকারীর আখ্যা দিয়ে থাকি।

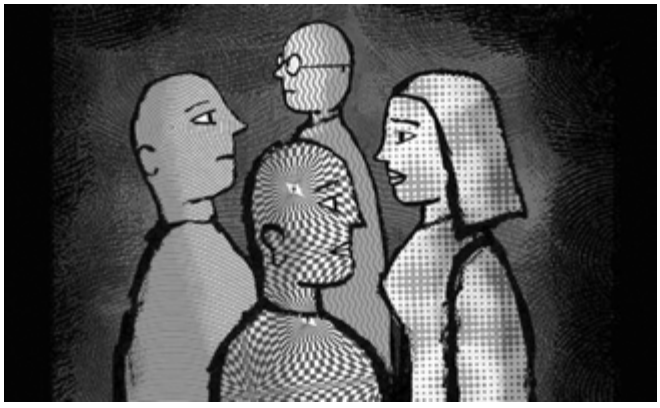

পাঠক মনে ভাবতেই পারেন, হঠাৎ এমন প্রসঙ্গের অবতারণা করা কেন? এটা যে গৌরচন্দ্রিকা সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। আসলে আজকে যে বিষয়ে লিখতে চলেছি সে বিষয়ে আসার আগে একটা কথা বিশেষ ভাবে বলা প্রয়োজন বলে মনে হচ্ছে। আমি যখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পিওর সাইকোলজি বিভাগে পড়াশোনা করেছি সেই সময় আমাদের শিক্ষক-শিক্ষিকারা অত্যন্ত যত্ন করে একটা কথা শিখিয়েছিলেন— অস্বাভাবিক মনস্তত্ত্ব (abnormal psychology) বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করেছি বলেই মানুষের সামান্য অস্বাভাবিক আচরণকে লক্ষ্য করে তার গায়ে অস্বাভাবিকতার সিলমোহর লাগিয়ে দেওয়াটা অনৈতিক ও অত্যন্ত গর্হিত কাজ। তাই একজন মানুষ মানসিক ভাবে অসুস্থ কিনা এবং তার কী অসুখ করেছে সেই রোগ নির্ধারণ করার আগে তার সামগ্রিক মানসিক অবস্থার পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা প্রয়োজন যাকে আমরা Mental Status Examination বলি। আর মানসিক অবস্থার স্বাভাবিকত্ব বিচার করতে গেলে অবশ্যই বিভিন্ন অস্বাভাবিকত্ব সম্বন্ধে বিশদে জানা দরকার। সে তো গেল সাইকোলজিস্টের কাজ। সাধারণ মানুষেরও এ বিষয়ে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। তা হলে দুটো উপকার হয়। প্রথমত অনেক ক্ষেত্রে নিজের অজান্তে আমরা যে সব অস্বাভাবিক আচরণের অভ্যাস গড়ে তুলি সেগুলোর সম্বন্ধে সচেতন হওয়া ও অভ্যাস না করার কাজটা করা সম্ভব হয়। দ্বিতীয়ত, আমাদের আশেপাশের মানুষজনদের মধ্যে অস্বাভাবিক আচরণ লক্ষ্য করলে সময় থাকতে থাকতে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়।

এবার তবে দীর্ঘ গৌরচন্দ্রিকার অবসান। আসল বিষয়ে আসা যাক।

Mental Status Examination কি?

ব্যক্তির মানসিক প্রক্রিয়াকরণ (mental functioning) গুলির পরীক্ষা করলেই তার বর্তমান মানসিক অবস্থার (mental state) সম্বন্ধে অবহিত হওয়া যায়। মানসিক প্রক্রিয়াকরণ কী তা সহজে বলতে গেলে বলতে হয় একজন মানুষ কি ভাবে চিন্তা করছে, কি ভাবে সব বিষয়কে দেখছে বা বুঝছে, কি ভাবে ব্যবহার করছে, কি ভাবে কথা বলছে ইত্যাদি ইত্যাদি।

Mental Status Examination-এর বিভাগগুলো কি কি? ১. Attitudes, Appearance and Behavior (প্রবণতা, দেখনদারি ও আচরণ), ২. Mood and Affect (মেজাজ ও মেজাজের বর্হিপ্রকাশ), ৩. Perception (সংবেদন, প্রত্যক্ষরণ), ৪. Thinking (চিন্তন), ৫. Judgement (বিচার),৬. Jusight (অর্ন্তদৃষ্টি)।

'Mental Status Examination'-এর মধ্যে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ এই ছয়টা অংশ নিয়ে বিশদে আলোচনা করা হবে। এই অংশগুলোর প্রত্যেকটাতে স্বাভাবিকত্বের মাপকাঠিতে অস্বাভাবিকত্ব বলে চিহ্নিত করতে গেলে কী কী পরিবর্তন লক্ষণীয় তার ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করা হবে।

১. Attitudes, Appearance and Behavior

'Attitudes' অর্থাৎ ব্যক্তির পরিস্থিতি বা অন্য মানুষের প্রতি আচরণের প্রবণতার প্রকৃতি কেমন? অর্থাৎ সে সহযোগিতাপূর্ণ ব্যবহার করছে না তার মধ্যে অসহযোগিতার ভাব দেখা যাচ্ছে। হয়তো দেখা গেল সে পরীক্ষকের (Examiner) সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনে অনিচ্ছুক, পরীক্ষকের মনে হল যেন তিনি একটা দেওয়ালের সঙ্গে কথা বলে চলেছেন। কখনও কখনও সেই মানুষ, যিনি হয়তো রোগী হিসেবে মনস্তত্ত্ববিদের কাছে এসেছেন, তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন প্রায় অসম্ভব তার সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ আলোচনা করা সম্ভব হয়। এই ক্ষেত্রে তা হলে দেখতে হবে ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন ও বন্ধুত্বপূর্ণ আলোচনা করা সম্ভব হচ্ছে কি না ও রোগীর সহযোগিতা করার মনোভাব আছে কি না।

'Appearance' বলতে বোঝায় ব্যক্তিটির বয়স অনুযায়ী তার শারীরিক গঠন স্বাভাবিক কি না, তার পোশাক পরিচ্ছদ যথাযথ ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কি না, চুল, নখ ইত্যাদি পরিষ্কার কি না। যদি এ সব স্বাভাবিক মনে না হয় তবে তার বিশদ বিবরণ রোগ নির্ণয়ে সাহায্য করতে পারে। এখানে একটা জরুরি বিষয় হল অ্যাপিয়ারেন্স সব সময়েই ব্যক্তির সামাজিক ও সাংস্কৃতিক (Socio-Cultural background) পরিমণ্ডলের নিরিখে বিচার্য হওয়া উচিত। যেমন পোশাকের অংশ দিয়ে মুখ ঢাকা কোনো কোনো ধর্মের বৈশিষ্ট্য হতে পারে।

ব্যক্তির বসার ধরণ দেখে বোঝা যেতে পারে যে যথেষ্ট আরামদায়ক অবস্থায় আছে না উত্তেজিত হয়ে আছে। সেই ধরণ অস্বাভাবিক হতে পারে। তেমনি psychomotor activity অর্থাৎ তার হাত পা নাড়ার ধরণ ও পরিমাণ লক্ষ্য করে দেখতে হবে যে সে স্বাভাবিক ভাবে আচরণ করছে না সে ক্ষেত্রে কিছুটা অস্বাভাবিকত্ব দেখা যাচ্ছে। হয়তো দেখা যাচ্ছে সে ব্যক্তি অত্যন্ত অস্থির হয়ে পড়ছে। পা নাচাচ্ছে বা হাত ঘষছে বা এক মুহূর্ত বসেই আবার দাঁড়িয়ে পড়ছে। এইগুলো অত্যন্ত অস্থিরতার লক্ষণ। আবার কোনো ব্যক্তি হয়তো স্বাভাবিকের থেকে অনেক কম নড়াচড়া করছে বা ঝিমিয়ে রয়েছে। ম্যানারিজম্ সাইকোমোটর অ্যাক্টিভিটির ক্ষেত্রে এক অস্বাভাবিকত্ব। অদ্ভুত (odd) এবং বারংবার (repetitive) করতে থাকা কোনো মুভমেন্টকে ম্যানারিজম্ বলে। অবশ্য এই মুভমেন্ট কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যে করা হতে পারে। আবার উদ্দেশ্যহীন ভাবে কোনো পেশিগত মুভমেন্ট বা মৌখিক প্রতিক্রিয়া বারবার করা হলে তাকে স্টিরিও টাইপ বলা হয়। 'ইকোপ্রাসিয়া' হল আর এক ধরনের মুভমেন্টজনিত অস্বাভাবিকত্ব। এক্ষেত্রে ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির মুভমেন্ট বা দেহ ভঙ্গি স্বয়ংক্রিয় (automatic) ভাবে নকল করে। ইকোলালিয়া হল অন্যের কথা শোনামাত্রই তোতাপাখির মতো তা নকল করে বলে ওঠা। কমপালসম্ এক ধরনের সাইকোমোটর অ্যাক্টিভিটির অস্বাভাবিকতা যাতে ব্যক্তি বুঝতে পারে তার কাজগুলো স্বাভাবিক নয় (যেমন— বারবার হাত ধোয়া) কিন্তু সে নিজেকে আটকাতে পারে না।

যেমন মুভমেন্টের উপরিউক্ত অস্বাভাবিকতা লক্ষ করা যায় তেমন গলার আওয়াজ ও কথা বলারও অনেক রকম অস্বাভাবিকতা লক্ষ করা যায়। যেমন— অনাবশ্যক জোরে চেঁচিয়ে কথা বলা বা উত্তেজিত ভাবে কথা বলা। কথা বলার গতি এতটাই দ্রুত যে তার কথার মাঝে কথা বলা অসম্ভব। তাকে কথার প্রেসার বলে। কথার প্রাসঙ্গিকতা আছে কিনা সেটা দেখাও অত্যন্ত জরুরি। অপ্রাসঙ্গিক কথা বলার লক্ষণ আসলে অস্বাভাবিক মানসিকতার লক্ষণ। যেমন নতুন নতুন শব্দ বলার প্রবণতা এক রকমের অস্বাভাবিকতা যাকে বলা হয় নিওলগিজম্। ইকোলালিয়ার কথা তো আগেই বলা হয়েছে। এই সব ধরনের বিষয়গুলো লক্ষ করা আবশ্যক। অস্বাভাবিক মানসিকতার মানুষের মধ্যে এই সব অস্বাভাবিকতার এক বা একাধিক জিনিস লক্ষ করা যেতে পারে। তবে কোনো একটা অস্বাভাবিকতা উপস্থিত আছে বলেই তাকে মানসিক ভাবে সম্পূর্ণ অসুস্থ বলা যায় না। আরও অন্যান্য অংশগুলো খতিয়ে দেখা প্রয়োজন।

২. Mood and Affect

মুড্ বলতে আমরা ব্যক্তির মন মেজাজের প্রকৃতি বা ধরণ বোঝাই। যেমন— হ্যাপিনেস, দুঃখিত হয়ে থাকা, চিন্তিত হওয়া, খিট্‌খিটে মেজাজ, নির্লিপ্ত ভাব। ব্যক্তির আচরণ লক্ষ করে ও তার মুখের ভাব থেকে তার মেজাজ সম্বন্ধে ধারণা পাওয়া যেতে পারে। মেজাজ সম্বন্ধে ব্যক্তিই পরীক্ষককে জানাতে পারে অর্থাৎ মেজাজ সাব্‌জেক্টিভ (subjective)। আর মেজাজের বহিঃপ্রকাশ (effect) পরীক্ষক পর্যবেক্ষণ করেন তাই তা অব্‌জেক্টিভ (objective)। মেজাজের বহিঃপ্রকাশ (effect) তার মেজাজের সঙ্গে খাপ না খেলে তা এক ধরনের অস্বাভাবিকতা। তাকে অনুপযুক্ত বহিঃপ্রকাশ (in appropriate affect) বলে। কোনো ব্যক্তি হয়তো দুঃখ প্রকাশ হিসাবে হাসল বা আনন্দের প্রকাশ হিসাবে কাঁদল। মেজাজ বিভিন্ন রকমের হতে পারে যেমন অত্যধিক উত্তেজিত মেজাজ। ডিপ্রেসড্ মুড মানে অপেক্ষাকৃত ঝিমিয়ে থাকা। এগুলো মেজাজের অস্বাভাবিকতা বলে চিহ্নিত করা হয়। যদি মনমেজাজের অস্বাভাবিকতা লক্ষ করা যায় তবে মানসিক অসুখের সম্ভাবনা থাকতে পারে। খুব দ্রুত ও ঘন ঘন মেজাজ বদলানোও এক ধরনের অস্বাভাবিকতা।

৩. Perception

'Perception' অর্থাৎ প্রত্যক্ষ করা বলতে বোঝায় কোনো ব্যক্তি তার পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যা দেখে শোনে, অনুভব করে তাকে যখন সে নিজস্ব 'মানে' যোগ করে বোঝে তখন তাকে প্রত্যক্ষ করা বলে। অর্থাৎ কোনো ঘটনা বা কোনো পরিস্থিতি সম্বন্ধে ব্যক্তির অভ্যন্তরীণ ব্যাখ্যা হল তার পারসেপশন্ (perception) বা প্রত্যক্ষ।

এই 'প্রত্যক্ষ' নামক মানসিক প্রক্রিয়ার (mental functioning) অনেক অস্বাভাবিকতা দেখা যায়। যেমন— Illusion বা 'ভ্রম'। এক্ষেত্রে কোনো বস্তুকে ভুল ব্যাখ্যা করা হয়। অর্থাৎ দড়ি আছে তাকে সাপ মনে করা, কোনো ছায়া দেখে ভয়ঙ্কর কোনো অস্তিত্ব বলে ভয় পাওয়া ইত্যাদি ইত্যাদি। Hallucination যাকে অলীক অনুভূতি বলা যেতে পারে তা যে কোনো ইন্দ্রিয় দ্বারা কোনো উদ্দীপক ছাড়াই তৈরি হতে পারে— দেখা, শোনা, গন্ধ সোঁকা, স্পর্শজনিত এমন কি স্বাদজনিতও। ব্যক্তি হয়তো অন্যের অনুপস্থিতিতে কোনো শব্দ কারও গলার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে যা আসলে অমূলক বিভ্রান্তি ছাড়া কিছু নয়। অনেক ক্ষেত্রে আবার কেউ উপস্থিত নেই তাও সে চোখে কোনো মানুষকে দেখছে। একস্ট্রা ক্যামপাইন হ্যালুশিনেশন (Extracampine hallucination) — এ আবার যেখানে যে বস্তু প্রত্যক্ষ করার কোনও উপায় নেই সেখানে সেই বস্তু প্রত্যক্ষ করা হয়। যেমন দেওয়াল ভেদ করে কোনো বস্তু দেখতে পাওয়া। কাইনেস্‌থেটিক হ্যালুশিনেশন (kinesthetic hallucination)-এ আবার গতিশীল না থেকেও গতির একটা অনুভূতি আসে।

এছাড়াও বাস্তব প্রত্যক্ষের (perception of one's reality) ক্ষেত্রেও কিছু অস্বাভাবিকতা দেখা যায়। 'Depersonalisation' যেখানে ব্যক্তি সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন বোধ (detached) করে। ব্যক্তি যেন নিজের শরীর থেকে আলাদা হয়ে নিজেকে অদ্ভুত অবাস্তব কোনো অস্তিত্ব বলে প্রত্যক্ষ করে। যেমন— ব্যক্তি মনে করে তার মুখাবয়ব বিকৃত ও হাত লম্বা হয়ে গেছে। Derealization- এ ব্যক্তি বাহ্য জগতে বস্তু বা জায়গা বিকৃত ভাবে প্রত্যক্ষ করে। তাদের আকার ও মাপ পরিবর্তিত বলে প্রত্যক্ষ করা হয়। আরও কিছু অস্বাভাবিক প্রত্যক্ষ হল–

Deja vu : অচেনা জিনিসের সঙ্গে চেনাবোধ করা।

Deja enterndu : বর্তমানে শুনছে এমন কথা আগেই শুনেছে বা প্রত্যক্ষ করেছে বলে মনে হয়।

Deja fait : কোনও কাজ বা অভিজ্ঞতা যদিও তা আগে কখনও ঘটেনি ওই ব্যক্তির জীবনে তবুও তার মনে যেন এমনটা আগেই ঘটেছে।

Jamais vu : চেনা জিনিস দেখেও অচেনার অনুভূতি হওয়া।

৪. Thinking

চিন্তন প্রক্রিয়ায় অস্বাভাবিকতা অনেক মানসিক অসুখের মুখ্য লক্ষণ হিসাবে

ধরা হয়। আর চিন্তনে অস্বাভাবিকতা ব্যক্তির কথা বলার (speech) থেকেই বোঝা সম্ভব। চিন্তনের স্বাভাবিকতা লক্ষ করতে গেলে 'stream of thinking' অর্থাৎ চিন্তার স্রোত একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ। চিন্তা-স্রোতের অস্বাভাবিকতা বিভিন্ন ধরনের হয়, যেমন—

Flight of ideas : খুব দ্রুত চিন্তার বিষয় বদলাতে থাকে। যেমন অনেক চিন্তা হুড়মুড়িয়ে ঢুকে পড়ে মাথার মধ্যে ও ব্যক্তি তা বলতে থাকে।

Retardation of ideas : চিন্তার গতি খুব স্লথ হয়ে পড়ে ও বিষয় ও মানসিক প্রতিচ্ছবির (mental image) সংখ্যা কমতে থাকে।

Circumstantiality : চিন্তা বহু অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ে ঘুরতে থাকে ও অবশেষে প্রাসঙ্গিক বিষয়ে ফিরে আসে। যেমন— ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করা হল 'সে দুপুরে কি খেয়েছে'— তখন সে সকালে ঘুম থেকে উঠে কি দেখেছিল তারপর কি হল ইত্যাদি দিয়ে শুরু করে অবশেষে উত্তর করল সে দুপুরে কি খেয়েছে।

Tangentiality : এক্ষেত্রে ব্যক্তি প্রাসঙ্গিক বিষয় ছুঁয়ে অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ে চলে যায় এবং ঘুরে প্রাসঙ্গিকতায় ফিরতে পারে না। অর্থাৎ অনেক অপ্রাসঙ্গিক কথার পর যে প্রশ্ন করা হয়েছিল তার উত্তরে পৌঁছোতে পারে না।

Incoherence : কথার মধ্যে প্রাসঙ্গিকতার বাঁধন একদম ঢিলে হয়ে ওঠে। ব্যক্তির কথার মধ্যে কোনো যোগাযোগ খুঁজে পাওয়া মুশকিল হয়।

Perseveration : বারবার একই কথার পুনরাবৃত্তি হয়। থামতে বলা হলেও থামতে চায় না।

Blocking : এখানে চিন্তার স্রোতের পথ সম্পূর্ণ বন্ধহয়ে যায়। ব্যক্তি চিন্তা করতে অক্ষম হয়ে পড়ে।

Echolalia : তোতাপাখির মতো পরীক্ষকের কথা নকল করতে থাকা।

Obsession : বার বার অর্থহীন চিন্তা এসে পড়া। ব্যক্তি বুঝতে পারে এমন চিন্তা অর্থহীন তবু সে নিজেকে এই চিন্তার থেকে বিরত করতে পারে না।

Thought alienation : ব্যক্তি ভাবে যে তার চিন্তা বাইরের কোনও সংস্থা বা ব্যক্তি নিয়ন্ত্রণ করছে। যেমন Inscrition কেউ তার মাথায় চিন্তাগুলো ঢুকিয়ে দিচ্ছে। Withdrawl কেউ তার চিন্তা কেড়ে নিচ্ছে। broadcasting — ব্যক্তির চিন্তা অন্যরা সব পড়ে ফেলছে।

এগুলো গেল চিন্তার স্রোত ও নিয়ন্ত্রণ (Stream & Control) সংক্রান্ত অস্বাভাবিকতা।

এছাড়া চিন্তার বিষয়বস্তুতে অস্বাভাবিকতা দেখা যেতে পারে। যেমন —

Delusion : ব্যক্তির মনে ভুল ধারণা বদ্ধমূল হয়ে ওঠে এবং সেই ধারণার কোনো বাস্তব ভিত্তি খুঁজে পাওয়া যায় না। কিন্তু ব্যক্তি নিজে মনে করে তার সেই ধারণাই ঠিক।

Delusion -এর বশবর্তী হয়ে ব্যক্তি ভাবতে পারে বাড়ির সবাই চক্রান্ত করছে তাকে বিষ খাওয়ানোর জন্য বা রাস্তায় বেরোলে ভাবতে পারে যে অন্য সবাই তাকে নিয়েই আলোচনা করছে। বা সে নিজেকে খুব প্রভাবশালী ব্যক্তি ভাবতে পারে। আরও অনেক ধরনের delusion থাকতে পারে যেমন সে ভাবতে পারে অন্য একজন তাকে ভালবাসে। বাস্তবে হয়তো দেখা গেল ওই মানুষটা তার সঙ্গে কোনোদিন কথা বলে নি। অন্যকে সন্দেহ করার বাতিকতও এক ধরনের অস্বাভাবিকতা।

৫. Judgement :

অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে পরিস্থিতির মোকাবিলা বিচার-বুদ্ধি সমেত করতে পারলে বোঝা যায় ব্যক্তি Judgement স্বাভাবিক অবস্থায় আছে। ধরা যাক, কোনো ব্যক্তিকে প্রশ্ন করা হল, 'সে যে ঘরে বসে আছে তাতে আগুন লাগলে কি করবে?' তার উত্তরে আত্মহত্যার প্রবণতা যার আছে (depressive) সে বলতে পারে ওখানে বসে মরে যাবে। আবার delusion আছে এমন রোগী বলতে পারে, 'আমি এত শক্তিধর আগুন আমার কিছু করতে পারবে না।' এই দুই ক্ষেত্রেই বিচার করার ক্ষমতা নষ্ট হয়ে গেছে বোঝা যাচ্ছে। সামাজিক পরিস্থিতিতে মানুষের বিচারবুদ্ধি স্বাভাবিক থেকে অস্বাভাবিক জায়গায় পৌঁছোলে মারামারি বা গালাগালি করার আচরণ লক্ষ করা যায়।

৬. Insight :

Insight বা অন্তর্দৃষ্টি বলতে বোঝায় ব্যক্তি তার সমস্যা (মানসিক বা আচরণগত) সম্বন্ধে সচেতন কি না। মানসিক অসুখে অনেক ক্ষেত্রে (যেমন— সাইকোটিক রোগীর ক্ষেত্রে) অন্তর্দৃষ্টি নষ্ট হয়ে যায়।

উপরিউক্ত ছয়টা মানসিক প্রক্রিয়া ও তার বিভিন্ন বহিঃপ্রকাশ ছাড়াও আর একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মানসিক প্রক্রিয়া হল স্মৃতি। স্মৃতিভ্রংশ কথাটা আসলে রোগের উপসর্গ। স্মৃতিভ্রংশ বিভিন্ন কারণে হতে পারে। মস্তিষ্কের (brain) ক্ষতি হলে স্মৃতিভ্রংশ হতে পারে আবার অতিরিক্ত চঞ্চলতা ও অস্থিরতা থেকে মনোযোগের অভাব ঘটলে স্মৃতি অর্থাৎ মনে রাখার ক্ষমতা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। মানসিক স্বাস্থ্য পরীক্ষার সময় তিন ধরনের স্মৃতি পরীক্ষা করা হয়। দূরগত স্মৃতি (remote memory), নিকট অতীতের স্মৃতি (Recent memory) এবং তাৎক্ষণিক স্মৃতি (Immediate memory) দূরগত স্মৃতি বলতে অনেক বছর আগেকার ঘটনা মনে আছে কিনা দেখা হয়। নিকট অতীতের স্মৃতি বলতে গত এক দুই মাসের ঘটনা মনে আছে কিনা দেখা হয়। তাৎক্ষণিক স্মৃতি বলতে সেই মুহূর্তে পাঁচ থেকে ছয়টা সংখ্যা পর পর বলা হয় ও তারপর দেখা হয় ব্যক্তি তা পুনরাবৃত্তি করতে পারছে কিনা। স্মৃতি বিভিন্ন অসুখে দুর্বল হয়ে পড়তে পারে। যেমন বিষাদ রোগে স্মৃতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আবার অরগ্যানিক সেন্ট্রাল ডিসঅর্ডারেও স্মৃতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়, এর মধ্যে সব থেকে পরিচিত হচ্ছে অ্যালজাইমার রোগ।

এই দীর্ঘ আলোচনার একটাই উদ্দেশ্য, তা হল আমাদের মানসিক প্রক্রিয়া ব্যাহত হলে যে অস্বাভাবিকতা দেখা দেয় তার সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা গড়ে তোলা যাতে দৈনন্দিন জীবনে নিজের ক্ষেত্রে বা অন্য মানুষের ক্ষেত্রে এই ধরনের অস্বাভাবিকতা দেখা দিলে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে। তবে মনে রাখতে হবে এই সব অস্বাভাবিকতা সাধারণ ভাবে ও অল্প পরিমাণে অনেকের মধ্যে দেখা যেতে পারে। কিন্তু তা যদি মাত্রাতিরিক্ত হয়ে উঠে দৈনন্দিন জীবনকে ব্যাহত করে তবে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া প্রয়োজন।

লেখক পরিচিতি : রুমঝুম ভট্টাচার্য, মনোবিদ (ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট) ও প্রাবন্ধিক, প্রাইভেট প্র্যাকটিস করেন।

With Best Compliment from

SHINE PHARMACEUTICALS LTD.
P-77, KALINDI HOUSING ESTATE
KOLKATA - 700089

কালের ভালবাসা

সায়মদেব মুখার্জি

বিধাতা পুরুষ তাঁর নিয়ম অনুযায়ী একটা সময় নির্ধারিত করে দিয়েছেন, যে সময়ে সূর্যদেব দিন এবং রাতের মায়াজালে পৃথিবীকে ঢেকে ফেলেন। মানুষের জীবনে দিন ও রাত আসে। কিন্তু এই দিন ও রাতের খেলায় কোনো রকম সময়ের বন্ধন থাকে না। রাত আরও গভীরতর হয়। কোনো কোনো সময়ে চাঁদের আবছা আলো জীবনে কিছু স্বপ্নের হাতছানি এনে দেয়। দিন যখন হতে শুরু করে, মানুষ সেই জায়গায় নিজের ভাগ্যের সঙ্গে পরিহাস পর্যন্ত করতে পারে। ওমের ভাগ্যের সঙ্গে পরিহাস করছিল সেই কুরুক্ষেত্রের মতো কৃষ্ণের মায়া। একদিকে যখন জানা গেল, ওমের সেরিব্রাল পলসি নেই, তখন আনন্দ হওয়া সত্ত্বেও সেই আনন্দের মুখ দেখা গেল না।

ইতিমধ্যে ওমের বাবা চাকরির সূত্রে মূর্শিদাবাদের এক মহকুমা হাসপাতালে বদলি হলেন। কিন্তু সেই জায়গায় কোনো রকম স্পেশাল স্কুল ছিল না বলে ওমের মা ঠিক করলেন যে তিনি জীবনে এক নতুন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হবেন। কলকাতা ছেড়ে যাওয়ার সময় ওমের শারীরিক অবস্থা যা ছিল, তার চেয়ে অনেকটাই খারাপের দিকে গিয়েছে। 'স্প্যাসটিক সোসাইটি অফ ইস্টার্ন ইন্ডিয়া' বালিগঞ্জের সাময়িক আস্তানা ছেড়ে নিজস্ব এক ভিত গড়ে তুলছে তারাতলায়। ডাক্তারবাবু এবং ওমের মা ওমকে নিয়ে ভর্তি করতে গেলেন তার সেই পুরোনো স্কুলে। একদিক থেকে দেখতে গেলে, সেটি যেমন ওমের স্কুল, তেমন ওমের বাবা এবং মায়েরও গুরুকুল হয়ে উঠেছিল সেই জায়গাটা। ১৯৮০-র দশকে প্রতিবন্ধকতা সম্পন্ন ছেলে বা মেয়ে বাড়িতে জন্ম নিলে তাকে নিয়ে কেউ খুব একটা আশা করা তো দূরের কথা, উল্টে তাকে লুকিয়ে রাখাটাই বাঞ্ছনীয় মনে করত। কিন্তু কলকাতার এই অভিজাত পরিবার সব সময়েই উন্মুক্ত মানসিকতার পরিচয় রেখেছে। পরবর্তীকালে ওমের বাবা-মা-ই শুধু নন, যাঁরা ওই স্কুলে গিয়ে পৌঁছেছিলেন, যৌথ পরিবারের সেই প্রতিটা মানুষই কোনো না কোনো ভাবে, কোনো না কোনো সময়ে, কোনো না কোনো কারণে, সেই মানসিকতায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। অজান্তে স্বপ্নের বীজ রোপণ হয়ে গিয়েছিল ওমের মনে অনেক ছোটোবেলাতেই। সেই স্বপ্নের বীজ অনেকটা ফিনিক্স পাখির মতো। হীনম্মন্যতায় বারবার চুরমার হয়ে যায় স্বপ্ন, শেষ হয়ে যায় আত্মবিশ্বাস, কিন্তু কালের আশীর্বাদে সেই হারিয়ে যাওয়া বীজের থেকেই জন্ম নেয় স্বপ্নের কিছু চারা।

প্রথম দিন ওম যখন স্কুলবাসে করে স্কুলে পৌঁছোলো, হাবুডুবু খেতে শুরু করল স্কুলের বিশালত্বে। একটা ছোট্ট অঙ্কের ভুলে তাকে উচ্চতম পড়াশোনার স্থান থেকে একটা স্থান নীচে রাখা হল। ওমের অহংকারে প্রচণ্ড আঘাত লেগেছিল সেই সময়। সে মনে মনে ঠিক করে নিয়েছিল, কোনো না কোনো ভাবে তাকে মিডল স্কুল গ্রুপ-থ্রি থেকে মিডল স্কুল গ্রুপ-টুতে উঠতেই হবে। এক বছরের মধ্যে সেই প্রথম কোনো যুদ্ধে নতুন ভাবে জয়লাভ করতে পেরেছিল সে। পরের বছর জীবনের প্রথম প্রাইজটা সে পেয়ে যায়। শ্রেষ্ঠ ছাত্র হয় তার ক্লাসে।

বিধাতা পুরুষের আরেক খেলা আবার শুরু হয় ওমের সঙ্গে। শেষ বারের জন্য ওমের বাবা-মা আবার বিশ্বাস করে ফেলেন এক মৌলবীকে। ওম পরে মহাভারতে পড়েছে ধৃতরাষ্ট্রের কথা। তিনি নিজেকে আটকাতে না পেরে খেসারত দিয়েছিলেন তাঁর শত পুত্রকে। ওই মৌলবীর পর্বে ছিল নানা অত্যাচার। যেমন ছোটো ছোটো পায়রার গলা ছিঁড়ে ফেলে সেই রক্ত ওমের গায়ে লাগানো হত। ওমের বাবাকে আদেশ করা হত, কলকাতা থেকে বাঘের চর্বি জোগাড় করতে এবং তা মালিশ করা হতো ওমের সারা গায়ে। এছাড়াও মাঝরাতে ওমকে ঘুম থেকে তুলে দু'টো ধূপ এবং দু'টো মোমবাতি একটা আসনের চারদিকে লাগিয়ে সেই আসনে বসানো হত তাকে। এতে নাকি ওমের শরীর থেকে যে ভারসাম্য হারিয়ে যাচ্ছে, তা ধীরে ধীরে ফিরে আসবে। মহাভারত যতই পুরনো হোক না কেন, তার খারাপ দিক থেকে শিক্ষা নিয়ে কেউ ভালো পথে ফিরে আসতে পারে। জীবনের যে কোনো পরিস্থিতিতে ঠিক এবং ভুল পথ চেনা মানুষের ধর্ম। আর সেই ধর্মের পথেই আবার এগিয়ে পড়েছিলেন ওমের বাবা এবং মা। মৌলবীর কথামতো যখন দেখা গেল, ওমের বিন্দুমাত্র ভালো হল না, তখন আটমাস পর আবার ওমকে নিয়ে কলকাতায় থাকা শুরু করলেন মা।

কোনো পথে যাত্রা করতে গেলে কোনো পথিক পথ হারিয়ে ফেলতে পারে যদি সঙ্গে কোনো সুহৃদ না থাকে। ওই অসম্ভব কঠিন সময়ে ওম তার জীবনে আরও একজন সুহৃদকে পেল। 'স্প্যাসটিক সোসাইটি অফ ইস্টার্ন ইন্ডিয়া'য় স্বেচ্ছাসেবীরা আসতেন তাঁদের কিছু সময়কে সুন্দরতর করে নিতে। ওমের ক্লাস টিচার বুঝতে পারলেন, ওমের ক্ষেত্রে কোনো কোনো জায়গায় তাঁকে একক ভাবে মনোনিবেশ করতে হবে। তখন তিনি একজন স্বেচ্ছাসেবীকে ওমের সঙ্গে কাজ করার অনুরোধ করলেন। ওম তার জীবনে পেল ঝর্না আন্টিকে। ঝর্না আন্টির জীবন থেকেই ওম শিক্ষা পেল যে জীবনকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে নিয়ে যাওয়ায় কোনো কৃতিত্ব নেই। আন্টির প্রাপ্তবয়স্ক মেয়ে নিজের জীবন শেষ করে দিয়েছিল কম্পিউটার মার্কিং সিস্টেমের গলদে। যখন গণিতশাস্ত্রে স্নাতক স্তরের ফলাফলে ৯ এবং ০ জায়গা বদল করে হয়ে গেল ০ এবং ৯, সে শেষ করে দিল নিজেকে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বদান্যতায় নম্বর ঠিক হয়ে এসেছিল, এক বছর পরে। আর তার তিন দিন আগে তার জীবন শেষ হয়ে যায়। কে জানে, দেশ হয়তো এক ভাবী বৈজ্ঞানিককে হারিয়ে ফেলেছিল। আর হয়তো সেখান থেকেই শুরু হয় ওমের নতুন করে বাঁচার লড়াই।

ধৈর্য্য কখনও যে খারাপ ফল দেয় না এবং জীবন কখনও যে অভিযোগ করার জন্য নয়, সেই বীজমন্ত্র ওমকে দিয়েছিলেন ঝর্না আন্টি। সেই সময়ে স্কুলে ওম অজান্তেই চমক দিত অনেক সময়। সে কোনো ক্যুইজ কনটেস্টে কনিষ্ঠতম হয়ে যোগদান করাই হোক বা পরীক্ষায় পাশ করা। কালের সন্তান হয়ে ওম আরও বুঝেছিল যে চোখে চোখ রেখে যদি দাঁড়াতে হয়, তা হলে বারে বারে তাকে ভাঙতে হবে। এই ভাঙা-গড়ার অদ্ভুত খেলায় পরবর্তী আঘাত সেই সময় পেল সেই কিশোর। যখন সে তার প্রিয় অর্থশাস্ত্রের পরীক্ষায়

পাশ করতে পারল না। পাশ করতে না পারার কারণ কিন্তু পড়াশোনা করা নয়, পড়াশোনা করে সে তার সাহায্যকারী লেখিকাকে সঠিক উত্তরগুলো গুছিয়ে বলতে পারেনি। কথা বলার শক্তি সেই দিন হঠাৎ করে হারিয়ে ফেলেছিল ওম। স্বাধীনোত্তর ভারতের অর্থনৈতিক পরিকাঠামো তৈরি করা হয়েছিল, যখন যোজনা কমিশন এবং জওহরলাল নেহরু এনেছিলেন 'লিপ ফ্রগ' পলিসি, ওমের শারীরিক পরিকাঠামোও ঠিক এই পদ্ধতিতেই, হঠাৎ হঠাৎ করে এনে দিচ্ছিল এরকমই আঘাত। তার এক স্বপ্ন হয়তো আর একবার বিদায় নিল তার কাছ থেকে। অর্থনীতি নিয়ে তার পড়ার ইচ্ছা থাকলেও উপায় কি থাকবে?

(চ ল বে)

ক্যুইজ

স্বাস্থ্যের বৃত্তের এপ্রিল-মে সংখ্যায় কুষ্ঠরোগ সম্পর্কে আমরা অনেক খবর জেনেছি। এবার সেই রোগ নিয়ে ক্যুইজ। ক্যুইজটি তৈরি করেছেন **অভিষেক দাস** পুণে-তে এক মেডিকেল কলেজের ছাত্র।

প্রশ্ন :

১. কোন্ জীবাণু কুষ্ঠরোগের কারণ?
২. প্রাচীনকালে এই রোগকে বংশগত ও দেবতার অভিশাপের ফলে হয় বলে ভাবা হত - জীবাণুটা আবিষ্কারের পরে সে ধারণা বদলায়। কে কত সালে এই জীবাণু আবিষ্কার করেন?
৩. এই জীবাণু প্রাথমিকভাবে শরীরের কোনও তন্ত্রকে আক্রমণ করে?
৪. কী কী লক্ষণ দেখা গেলে কুষ্ঠরোগ সন্দেহ করা উচিত?
৫. এই রোগ কী ভাবে সংক্রমণ হয়?
৬. প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী কুষ্ঠরোগের ঘা থেকে যে রস বেরোয় তা সংক্রামক—এই ধারণা ঠিক না ভুল?
৭. মানুষের নিজস্ব রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা অনুযায়ী কুষ্ঠরোগ শরীরে বিস্তার লাভ করে। এই ক্ষমতা সবচেয়ে কম হলে কোন্ ধরনের কুষ্ঠরোগ হয়?
৮. জাতীয় কুষ্ঠনিবারণ প্রকল্প অনুযায়ী, কুষ্ঠরোগের চিকিৎসা কী ?
৯. চিকিৎসা না করে কুষ্ঠরোগকে দীর্ঘদিন অবহেলা করলে কী কী ধরনের অঙ্গবিকৃতি সবচেয়ে বেশি দেখা যায়?
১০. কুষ্ঠরোগ কীভাবে নির্ণয় করা হয়?

উত্তর ৬০ পৃষ্ঠায়

Advertisement

শ্রমজীবী স্বাস্থ্য উদ্যোগ ও সুন্দরবন কমপ্রিহেনসিভ এরিয়া ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল রিসার্চ সেন্টার-এর যৌথ উদ্যোগে কেনা হল একটি মোটর চালিত নৌকা।

সুন্দরবনের গোসাবা ব্লকে রোগী পরিবহন ও মেডিকেল টিমের যাতায়াতের জন্য ব্যবহৃত হবে এই যানটি।

এই নৌকাটি কেনার জন্য অর্থ সংগ্রহ করেছেন দেশ বিদেশে থাকা শ্রমজীবী স্বাস্থ্য উদ্যোগের বন্ধুরা। ট্যুরিস্ট সিজ্‌নে নৌকাটিকে ভাড়া দিয়ে উপার্জিত অর্থে সুন্দরবন সীমান্ত স্বাস্থ্য পরিষেবার খরচ চালানো হবে।

কম খরচে সুন্দরবন ভ্রমণের জন্য যোগাযোগ করুন—

সম্পাদক, শ্রমজীবী স্বাস্থ্য উদ্যোগ,

ফোন : ৯৮৩০৯২২১৯৪

উৎপল মণ্ডল, সুন্দরবন কমপ্রিহেনসিভ এরিয়া ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল রিসার্চ সেন্টার, ফোন : ৯০৮৮০৫০৫২৫

দুনিয়া কাঁপানো একদিন

সন্দীপ রায়

ঢক ঢক করে পুরো জলটা শেষ করে টেবিলের উপর ঠকাস করে গ্লাসটা রাখল পারমিতা। এই ঠকাস শব্দটার কমবেশির উপর মাপা যায় পারমিতার মেজাজের ওঠাপড়া। ওর অফিসের লোকজন সেটা জানে। আজকের আওয়াজটা ওপরের দিকে। মানে পারমিতার মেজাজ চড়া। রাহুল একটু সাবধানী পায়ে এগিয়ে এল। বলল— সামথিং গড়বড়, মিতাদি? পারমিতা তখন মাথার ক্লিপটা খুলে দাঁত দিয়ে চেপে ধরে চুলগুলো শাসন করতে ব্যস্ত। তাই ও মুখে কিছু বলল না, কিন্তু ওর তাকানোতেই রাহুল বুঝে গেল— প্রথম দানটাই ভুল হয়ে গেল। মিতাদি ডাক, পারমিতার একেবারেই না-পসন্দ। ও বলেই দিয়েছে, শর্টকাটই যদি করতে হয়, তবে ওর পছন্দ পারো। রাহুল তাই চট করে সামলে নেয় নিজেকে আর বলে— হোয়াট হ্যাপেন্ড, পারোদি?

উত্তরে পারমিতা বলল— আর বলিস না, আমার লাইনে গলা দিতে ইচ্ছে করে।

এই ইচ্ছেটা ওর এতবার হয়েছে যে প্রত্যেকবার ইচ্ছে পূরণ করতে হলে রাবণের চেয়েও বেশি গলার দরকার। কিন্তু এই একটা স্টেটমেন্টেই রাহুল বুঝল, গল্পের আগলটা খুলবে। এই সময়টা খুব সাবধানে থাকতে হয়। বে-ফাঁস কিছু বলে ফেললেই কেলো। তাই অফিসের অন্য কৌতূহলীদেরও এই সময়টাতে কনুই মেরে বা চোখ টিপে অ্যালার্ট করে দিতে হয়।

রাহুল আলতো করে শুধু সলতেটা উস্‌কে দেয়— তোমাকে খুব টেন্‌সড দেখাচ্ছে। একটু শেয়ার করো না আমাদের সঙ্গে।

দীপা ততক্ষণে চায়ের কাপটা এগিয়ে দিয়েছে। চায়ের কাপে প্রথম চুমুকটা দেওয়ার পরে পারমিতা মুখটা যেমন ভাবলেশহীন রাখে, যেন চায়ের কাপে চুমুক দেওয়াটা একটা অফিসিয়াল জব, মুখের মধ্যে ভালোমন্দ কোনও প্রতিক্রিয়াও পাওয়া যায় না— তাতে দীপাও নিশ্চিত হয়, দিদির মেজাজ সত্যিই চড়া। না হলে প্রথম চুমুকের পর হয় 'ফ্যান্টাসটিক' নয় 'ম্যাগো, কি বিচ্ছিরি' — দুটোর একটার প্রতিক্রিয়া দীপার রোজকার প্রাপ্ত। তাই দীপাও জিগ্যেস না করে পারে না— কী হয়েছে গো দিদি?

পারমিতা ততক্ষণে ওর চেয়ারে পিঠ ছেড়ে দিয়েছে। সেই অবস্থায় বলে— কী হয়নি বলো? রাহুলের দিকে তাকিয়ে বলে— আজ জোজোর রেজাল্ট আর তোদের প্রলয়দা মুম্বইতে। জাস্ট থিঙ্ক অফ্ ইট।

দীপা হাঁপ ছেড়ে বাঁচে। রাহুল ইয়ার-প্লাগটা আবার গুঁজে নেয়। যেন শুরুতেই শেষ হয়ে গেল গল্পটা। লাস্ট যে গল্পটা বলার সময় পারোদির লাইনে গলা দিতে ইচ্ছে হয়েছিল— সেটাতে অনেক মেটেরিয়াল ছিল, পাশের ফ্ল্যাটের সঙ্গে কী একটা ক্যাচাল— অনেকগুলো ক্যারেকটারের ইনভল্‌ভমেন্ট, অনেক নাটকীয় ওঠা পড়া ছিল, 'সব কটাকে পুলিশে দেব'— এই জাতীয় সংলাপ ছিল। আর আজ শুধু জোজো আর প্রলয় দা— দু'টো মাত্র চরিত্র। আর ছেলের রেজাল্ট? সে তো প্রতি বছরের ইভেন্ট। এর মধ্যে নাটক কই? রাহুল তাই ওর ব্যক্তিগত কানে ভেসে আসা সুরে টেবিলে তাল দিতে দিতে বলে— রেজাল্ট তো কী! সে তো প্রতিবছরই বেরোয়।

বোকা বোকা কথা বলিস না রাহুল— ঝামটে ওঠে পারমিতা। সেটা পৌঁছোয় না রাহুলের কানে। ও এক কানের ইয়ার-প্লাগ নামিয়ে বলে— কী বলছ?

পারমিতা বলে— হাঁদার মতো কথা বলছিস। প্রতি বছর কি জোজো মাধ্যমিক দেয়?

ইয়ার প্লাগের বদলে রাহুল এবং ওর দু'টো হাত কানে তুলে দেয় আর অপরাধীর মতো কবুল করে— জোজো যে মাধ্যমিক দিল এবার, একদম খেয়াল ছিল না।

কম কথার মানুষ ভট্‌চাযদাও এবার মুখ খোলে। গত এক বছরে অফিসে দ্য মোস্ট ডিসদাসড্ টপিকটাই তুমি ভুলে গেলে রাহুল— তোমার তো ভিআরএস নেওয়া উচিত।

রাহুল তখন গান শোনা মুলতুবি রেখে একটা চেয়ার টেনে পারমিতার টেবিলের উল্টো দিকে পায়ের উপর পা তুলে বসে। রিভল্‌ভিং চেয়ারটা একবার বাঁ দিকে, একবার ডান দিকে ঘুরে ঘুরে একটা কল্পিত অর্ধবৃত্ত তৈরি করে। জিরো প্লট থেকে গল্প তুলে আনতে চাইছে রাহুল। বলে— আসলে জোজোটা যে এত বড়ো হয়ে গেল, বিশ্বাসই হয় না।

পারমিতা ততক্ষণে কম্পিউটার অন্ করে ফেলেছে। স্ক্রিনে চোখ রেখেই বলে— বড়ো কি রে? ফোর্টিন প্লাস মাধ্যমিক দিল। আর কটা দিন এদিক ওদিক হলে ওকে তো অ্যালাউই করত না।

রাহুল বলে— তাই তো, এই তো সেদিন তোমার বিয়ে হল।

ভটচায্‌দা বলেন— তুমি পারোও রাহুল, তুমি কি ওর বিয়েতে গিয়েছিলে, না এই চাকরিতে ঢুকেছিলে তখন, যে 'এই তো সেদিন', 'এই তো সেদিন' করছ।

রাহুল একটু ব্যাকফুটে গিয়ে বলল— না, মানে আপনাদের কাছে এত গল্প শুনি পারোদির বিয়ের, যে আমার মনে হয় আমিও গিয়েছিলাম।

পারমিতা আবার পিঠ এলিয়ে দেয় চেয়ারে। বলে— তোর প্রলয়দার হ্যাংলামি। না হলে আজকালকার দিনে ওটা একটা বিয়ের বয়স? এই তো সেদিনও আমার দিদির এক বান্ধবীর বিয়ে খেয়ে এলাম, থার্টিসিক্স।

এই শেষ অংশটুকু সম্ভবত দুটো ডেস্‌ক পেরিয়ে জবাদির উদ্দেশ্যে বলা— আওয়াজটাও ওপরের দিকে। কাঁচের আলোক দেয়াল পেরিয়ে সেটা পৌঁছেও যায় যথাস্থানে।

ওপাশ থেকে উত্তরও আসে প্রায় তৎক্ষণাৎ— আমার দিদিরও তো তাই। বাবা বরাবর বলে এসেছে, আগে যদ্দুর ইচ্ছে লেখাপড়া করো, তারপর সংসার।

দিদি যে পিএইচ ডি করেছে, এই তথ্যটা আরেকবার মনে করিয়ে দেওয়া গেল ভেবে জবাদি আনন্দে আর একটু চালিয়ে খেলতে চাইছিল, বাদ সাধল ভটচায্‌দা। বলল, রাহুল, তোমার টেবিলে দু'জন অপেক্ষা করছেন। ওদের

ছাড়ো।

রাহুল উঠে পড়ে। নিজের চেয়ারে যাবার আগে হালকা ভাবে ভাসিয়ে দেয়— তুমি এত প্রেশারে আছে পারোদি, আজই জোজোর রেজাল্ট, আজকে তো ছুটি নিতে পারতে।

—বাড়িতে থাকলে একা একা আরও টেন্‌সড হচ্ছিলাম। জোজো তো স্কুলে বেরিয়ে গেছে সেই সকালে। শুনলাম রেজাল্ট পেতে পেতে নাকি সেই বারোটা। তাই চলে এলাম— টানা এই পর্যন্ত বলে পারমিতা খেয়াল করে, জবাদি জলের বোতলটা নিয়ে উঠে এসেছে অ্যাকোয়াগার্ডে জল ভরতে। ওর মনে পড়ে, টানা দু'দিন ছুটি নিয়ে জবাদি আজই জয়েন করল। অতএব পারমিতা জুড়ে দেয়— আর কথায় কথায় অত ছুটি নিতে পারি না রে। অফিসটা আমার কাছে ফ্যামিলির মতো।

জবাদি ততক্ষণে বোতলের মুখ টাইট করতে করতে ফিরছিল। বলল— তোদের তো টোনাটুনির সংসার। তাই অফিসে ফ্যামিলি লাইফের ফ্লেবারটা নিতে হয়। আমাদের তো জানিস। এরা নিজেরাই তিন ভাই। তারপর এ লোক সে লোক লেগেই আছে। এই তো দুটো দিন ছুটি নিলাম। দু'দিনই গড়িয়াহাটে কেটে গেল এর ওর গিফ্‌ট কিনতে। ফ্যামিলি বড়ো হলে দায়িত্বও তো বাড়ে না কি?

কথাগুলো বলে জবাদি আর দাঁড়াল না। রাহুল দেখল, জবাদির আজ ব্যাটে বলে হচ্ছে ভালো। পারোদিও ফর্মে আছে। এরকম বলতে থাকলে কম্পিউটারে গেম খেলে টাইম পাস করতে হয় না। এবার পারমিতাদির টার্ন। কিন্তু ঠিক এই সময়েই চেম্বার ছেড়ে বেরিয়ে এলেন বস। কোথাও বেরোবার তাড়া আছে সম্ভবত। তারই মধ্যে বসকে পাকড়াও করে ফেলে পারমিতা। স্যার বলছিলাম কী, আজ আমার ছেলের রেজাল্ট।

বস, মি. দত্ত, যিনি নিজের পদবি-র বানানটি দিয়ে শেষ করেন, শেষের 'এ'টা আর দেন না, তিনি বললেন— ও ফাইন! তা আমাদের জন্য একটা পার্টি থ্রো করবেন না।

পারমিতা বলে— সিওর স্যার।

মি. দত্ত আবার জিগ্যেস করেন— কেমন হল পার্সেন্টেজ?

পারমিতা বলল— বেরোয়নি স্যর, রেজাল্ট এখনও বেরোয়নি।

দত্ত একটু অবাক হয়ে বললেন— তো?

পারমিতা বলে— রেজাল্ট বেরোয়নি, আমি বেরোব। মানে বুঝতেই পারছেন স্যার, ভীষণ টেনসড্।

দত্ত বলেন— বেশ তো। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে হাতের কাজগুলো গুছিয়ে বেরিয়ে পড়ুন। হাফ ডে নিয়ে নিন। ব'লে দত্ত আর দাঁড়ান না। গেটের দিকে এগোতে এগোতে বলেন— বেস্ট অফ্ লাক, পারমিতা।

থ্যাঙ্কু স্যার...। যতটা সম্ভব টেনে টেনে বলে পারমিতা। তারপর রাহুলের টেবিলের সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

ভট্‌চায্‌দা আওয়াজ দেন— বামুন গেলো ঘর, তো লাঙল তুলে ধর।

পারমিতা বলে— ভটচায্‌দা কিছু বেঙ্গলি প্রোভার্ব জানেনও বটে। আমি তো অনেকগুলোর মানেই বুঝি না।

রাহুল কি বোর্ডে আঙুল চালাতে চালাতে বলে, তোমাকে এখন আর ওসব মানে বুঝতে হবে না। বোসো এখন।

পারমিতা রাহুলের সামনে চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসে। বলে— দীপাদি, আরেকবার একটু চা দাও না গো। ভীষণ মাথাটা ধরেছে।

রাহুল জিগ্যেস করে— মেয়েদের খুব মাথা ধরে, না? আমার বউয়েরও দেখেছি। কেন গো?

পারমিতা বলে— তার কারণ, মেয়েদের মাথা বলে একটা ব্যাপার আছে গো। এই তো, দ্যাখ না, এগারোটা বেজে গেল, তোর প্রলয়দা একটা ফোন করল এখনও? আমাকে বলেছে— মিটিং চলছে। মিটলে ও-ই ফোন করবে। বোঝ তাহলে। ছেলের রেজাল্ট। ওর মিটিংটাই বড়ো হল।

রাহুল তাল দেয়— ঠিকই তো। তা-ও মাধ্যমিক বোর্ডের কারোর সঙ্গে মিটিং হলেও কথা ছিল।

ফাজলামি করিস না রাহুল, ছেলেপুলে হোক, তখন বুঝবে, কেমন টেনশন হয়— বলে পারমিতা হ্যান্ডব্যাগ থেকে পার্স বের করে, পার্সের সঙ্গে লাগানো আয়নায় নানা কসরত করে নিজের মুখটাকে দেখে, চৌকো, ছুঁচোল, লম্বাটে করে, রুমাল দিয়ে ঠোঁটের কোণাগুলো মোছে। আলতো করে লিপস্টিক বোলায় ঠোঁটে।

দীপা এসে বলে— তোমার চা এখানে দেব, না তোমার টেবিলে?

পারমিতা বলে— টেবিলে দাও, আমি আসছি। এরপর রাহুলকে— নেটে জোজোর রেজাল্টটা একটু দেখে দে না রাহুল, ছেলেটা সকাল থেকে চেষ্টা করছিল। বলছে লাগাতেই পারছে না।

রাহুল বলে— রোল নম্বরটা দাও। দেখছি। পারমিতা চেয়ার থেকে উঠে রাহুলের দিকে ঝুঁকে পড়ে বলে— পেলে আমাকে ডাকিস চুপচাপ, হাট বাঁধাস না। বলে নিজের টেবিলের দিকে যায়।

আজ সকাল থেকে যাচ্ছেও বটে— পারমিতা ভাবে। টেনশনে ভালো করে ঘুমও হয় নি। এই সময়ে প্রলয়টা বাইরে। ও থাকলে ছেলেটাও তো একটু সাহস পেত। অবশ্য জোজোর ঘুমের বহর দেখে মনে হচ্ছিল না যে আদৌ ওর মধ্যে কোনও টেনশন আছে। রেজাল্ট যেন পারমিতার বেরোবে। শেষে পারমিতাকে ঠেলতে হয়— ওরে ওঠ্। ভুলে গেলি নাকি, রেজাল্টের কথা। জোজো পাশ ফিরে বালিশটা আঁকড়ে বলে— এখন কী?

এখন কী মানে? তোর এত নিশ্চিন্তে ঘুমটা হয় কী করে? একেবারে লাইক ফাদার লাইক সন।

শুয়ে শুয়েই জোজো আশ্বাসের ভঙ্গিতে বলে— অত চাপ নিও না মা। যা হওয়ার তা তো হয়েই গেছে। এখন লাফঝাঁপ করলে কি রেজাল্ট বদলে যাবে?

থাপ্পড় খাবি জোজো, ডেঁপোমি করলে। পারমিতা চেঁচিয়েছিল।

এতেও কোনও কাজ হল বলে মনে হল না। জোজো শুয়েই রইল।

এরপর প্রলয়কে ফোনে ধরল পারমিতা। ফোন ধরেই প্রলয় ভালগার রসিকতা শুরু করল। কে জানে, কাল রাতে খানাপিনা জোরদার চলেছে নিশ্চয়ই। অফিস ট্যুর মানেই তো তাই। ফুর্তিবাজি। হয়তো ভুলেই গেছে ছেলের রেজাল্ট আউটের কথা। প্রলয় বলল— ভুলব কেন? আমি কাল রাত্রেই জোজোকে উইশ করেছি।

উইশ করলেই হয়ে গেল? প্রলয় বলল— রেজাল্ট হাতে পেতে পেতে বারোটা বাজবে শুনলাম। আমি তখন মিটিং-এ থাকব। মিটিং হয়ে গেলে আমিই কল্ করে নেব।

বোঝো একবার। রেসপনসিব্‌ল ফাদার! কোম্পানিই ওর বউ ছেলে সব।

আর কেউ চাকরি করে না। আরে বাবা, বাইরের লোকের কথা বাদ দাও, নিজের দিদি-জামাইবাবুকে তো দেখো। ওদের ছেলেও তো এবার সিবিএসই দিচ্ছিল। বাপ-মা ছেলেটাকে নিয়ে কী না করেছে। রেজাল্টও করেছে সেরকম। এখন জোজোর রেজাল্ট, ঠাকুর না করুন, উল্টোপাল্টা যদি কিছু হয় মুখ দেখানো যাবে আর? একে তো দিল্লি-বোর্ড বলে ওদের একটা নাক-উঁচু ব্যাপার আছে, আর ছেলের রেজাল্ট-টেজাল্টও বলার মতোই। এইট্টি-নাইন পার্সেন্ট। নিজেদের জানানোর সময় হয়নি। প্রলয়ই ফোন করে জেনেছিল। পারমিতার ইচ্ছে করছিল বলে দেয়— দিল্লি বোর্ড মানে ফাইভ পার্সেন্ট ছাড়তে হবে। সত্যি কথাই তো। ওদের তো বেশি বেশি নম্বর। তার মানে এইট্টি ফোর পার্সেন্ট। জোজোর যদি সেটাও না হয়।

এ সব ভাবতে ভাবতেই প্রলয়ের দিদির ফোন। আদিখ্যেতা। সাত সকালে রেজাল্ট জানতে চাইছে। পারমিতা ভাবছিল ধরবেই না ফোনটা। শেষমেশ ধরল। কীরে উঠিস নি এখনও? ননদের প্রশ্নের উত্তরে পারমিতা মিষ্টি করেই বলল— না গো। আসলে আমাদের কোনও টেনশন নেই। তোমার ভাই বলে, টেনশন করে কী হবে? যা হবে তা তো হবেই। তবে বেঙ্গল বোর্ড তো। খুব চেপে চেপে খাতা দেখে। দেখা যাক্। রেজাল্ট পেলেই জোজো ফোন করবে তোমাদের।

ফোনটা রেখে পারমিতা ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়াল। রাত্তিরে ভালো ঘুম হল না। চোখের তলায় কালি পড়ল না কি? কিন্তু সত্যিই ছেলেটার চিন্তায় ও হয়তো এক দিন পাগলই হয়ে যাবে। রাহুল তো একদিন কথায় কথায় বলেওছিল— তুমি একবার সাইকিয়াট্রিস্টের পরামর্শ নিতে পারো— পারোদি। তখন পারমিতা মুখ ঝামটে উঠেছিল — আমি কি পাগল? এখন ভাবে একবার কনসাল্ট করে দেখাই যায়। এত টেনশন নেওয়া যায় না।

আবার ফোন। ছুঁড়ে ফেলে দিতে ইচ্ছে করে মাঝে মাঝে ফোনটা। পারমিতা ফোনটা হাতে নিল। মা সকালে উঠে মাকে ফোন করাটা ওর ডেলি রুটিন। আজ সেটাও ভুলে গেছে। বলো মা— পারমিতা ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে করতে কথা বলতে লাগল। প্রলয়ের কথা, জোজোর কথা, ননদের ফোন— বেশ লম্বা কথাই হল। রোজই হয়। ফোন রেখে পারমিতা দেখল সাড়ে আটটা বেজে গেছে। অফিসে বেরোতে হবে। ফ্রিজে যেটুকু যা আছে, ওগুলোই গরম-টরম করে নেবে এখন, ওবেলা জোজোকে ভালো কোনও ডিশ বানিয়ে দেবে। ঠাকুর ঠাকুর করে যদি .... ঠিকঠাক হয় তবে প্রলয় ফিরলে ভালো ভাবে সেলিব্রেট করা যাবে।

পারমিতার সঙ্গে সঙ্গে জোজোও বেরোল। সে-ই দেরিই হল অফিসে ঢুকতে। আজ অবশ্য দেরি হতেই পারে। যা টেনশন! অন্য কেউ হলে অফিসেই আসত না। পারমিতা আবার এ ভাবে রেস্পন্সিবিলিটি স্কিপ করতে পারে না।

পারমিতা ঘড়ির দিকে তাকাল। বারোটা তো বেজে গেছে। জোজো কি এখনও রেজাল্ট পেল না? ও আর পারছে না। এত টেনশন নেওয়া যায় না। প্রলয়ও ফোন করল না। এখনও মিটিং চলছে। অসহ্য! পারমিতা কম্পিউটার অফ্ করল। এবার ও উঠে পড়বে, কপালের দু'পাশ টিপ্‌টিপ্ করছে। বাড়িতে গিয়ে একটা সারিডন খাবে।

ব্যাগের ভেতরে ফোনটা বাজছে। পারমিতা তাড়াতাড়ি ফোনটা বের করল। জোজো, জোজো ফোন করেছে। পারমিতার হাতের তালু ঘামতে শুরু করেছে। তাড়াতাড়ি করে ব্যাগটা কাঁধে ঝুলিয়ে অফিস থেকে বেরিয়ে ল্যান্ডিং-এ চলে এল ও। বাঁ-হাত দিয়ে নিজের মুখ থেকে ফোন পর্যন্ত একটা ব্যারিকেড তৈরি করে নিচু স্বরে জিগ্যেস করল— বল জোজো, কী খবর?

জোজো উত্তরে বলল— মা, এইট্টি সিক্স পার্সেন্ট।

পারমিতা কোনও রি-অ্যাক্টই করতে পারল না। শুধু বলল— ও। খানিকক্ষণ পর বলল— লেটার কটায় হল?

জোজো বলল— আরে দূর। মার্কশিট এখনও হাতে পাইনি। শুধু লিস্ট টাঙিয়েছে।

পারমিতা বলল— আচ্ছা, আচ্ছা, তুই বাড়ি আয়, আমি যাচ্ছি। ও আরও কিছু জিগ্যেস করতে যাচ্ছিল, কিন্তু জোজো ততক্ষণে ফোন কেটে দিয়েছে। পারমিতা ফোনটা মুঠোয় করে খানিকক্ষণ ল্যান্ডিং-এই দাঁড়িয়ে রইল। মনে মনে হিসেব কষল— ননদের ছেলের বুম্বার এইট্টি নাইন— কিন্তু ফাইভ পার্সেন্ট বাদ যাবে। তার মানে এইট্টি ফোর। জোজোর থেকে টু-পার্সেন্ট কম। পারমিতা বাইরে না গিয়ে আবার অফিসে ঢুকল। ঢুকে জবাদির উইন্ডোর সামনে এসে দাঁড়ালো। বলল— জবাদি— এইট্টি সিক্সস।

জবাদি ওর জলের বোতলটা এগিয়ে দিয়ে বলল— নে, একটু জল খা।

ততক্ষণে রাহুল উঠে এসেছে। এইট্টি সিক্স! পারমিতা বলল— হ্যাঁ, আজ পর্যন্ত আমাদের পাড়ায় হায়েস্ট!

ভটচায্‌দা ওর টেবিল থেকেই বলল— এর মধ্যে গোটা পাড়া চষে ফেললে! রাহুল ভালো মানুষের মতো মুখ করে বলল— গত বারের আগের বারে তোমাদের পাড়ার ডা. নন্দীর নাতনি ডিস্ট্রিক্টে র‍্যাঙ্ক করেছিল না? নাইনটি পার্সেন্টের কাছাকাছি পেয়েছিল বলেছিলে। বলেই রাহুল চোখ বন্ধ করে ফেলে। এবার একটা বোমা ফাটবে।

পারমিতা কিন্তু মোটেই রাগ করল না। বলল— তোর কি চোখ, কান, মাথা সবই গেছে— রাহুল?

রাহুল চোখ খুলে বলল— কেন?

পারমিতা বলল— ডা. নন্দীর বাড়ির ঠিক আগে অতবড় একখানা কালভার্ট তোর চোখে পড়েনি?

রাহুল এবার সত্যিসত্যি অবাক হয়ে বলল— তো? পারমিতা প্রত্যয়ের সঙ্গে বলল— ওই কালভার্টেই তো আমাদের পাড়া শেষ। ডা. নন্দীর বাড়ি থেকে আলাদা পাড়া।

ভটচাযদা রাহুলের দিকে তাকিয়ে গোটা গোটা করে বলল— এবার বুঝেছো?

রাহুল হো হো করে হেসে বলল— ওহো, তাইতো, তবে তো বেশ জম্পেশ করে খাওয়া, পারোদি।

পারমিতা বলল— তোর প্রলয়দা ফিরলে। রাহুল নাছোড়বান্দা। বলল— আর আজকে? আজকে ছোটো করে হয়ে যাক।

জবাদি বলল— আজ আর কত খাবি, রাহুল? দীপাদিও তো আজ খাওয়াচ্ছে। দীপা ততক্ষণে দুটো করে মিষ্টি থার্মোকলের প্লেটে তুলে ওদের দিতে শুরু করেছে।

পারমিতা একটু অবাক হয়ে পরক্ষণেই বলল— ও হো। তোমার ছেলেও তো এবার পরীক্ষা দিয়েছিল দীপাদি। একদম ভুলে গেছি। কেমন হল গো?

দীপা লাজুক হেসে বলল— কেমন আবার? ফার্স্ট ডিভিশন হয়েছে। এই

আর কী। তবে আমাদের বংশে প্রথম ফার্স্ট ডিভিশন।

পারমিতা এগিয়ে গিয়ে দীপার কাঁধে হাত রেখে আলতো চাপ দিল— যাতে অভিনন্দনও বোঝায়, আবার আদরও বোঝায়। দীপা সুন্দর করে ওর দিকে তাকিয়ে হাসল।

রাহুল মোবাইলটা বাড়িয়ে বলল— ওয়াও। দুই সেলিব্রিটির মা! একজন পাড়ায় ফার্স্ট, একজন বংশে। দাঁড়াও, দুজনের একটা ছবি তুলি।

পারমিতা বলল— ফাজলামি করিস না রাহুল। বলল বটে, কিন্তু দু'জনেই হাসি মুখে পোজ দিল।

ক্যামেরায় আওয়াজ হলো ক্লিক।

৫৬ পৃষ্ঠার ক্যুইজের উত্তর :

১. মাইকোব্যাকটেরিয়াম লেপ্রি।
২. জি এইচ আরমার হ্যানসেন, ১৮৭৩ সালে।
৩. স্নায়ুতন্ত্র।
৪. শরীরের কোনও স্থানে হাল্কা সাদা অথবা লালচে ছোপ— যেখানে অনুভূতি কম থাকে; স্নায়ু (সাধারণত হাত ও পায়ে) মোটা হয়ে যায়, যেখানে সামান্য আঘাত লাগলে ঝনঝন করে। এই দাগে লোম উঠে যায় ও ঘাম হয় না। নাকে, কানের লতিতে, মুখে গুটি হতে পারে।
৫. নিঃশ্বাসের মাধ্যমে।
৬. ভুল।
৭. লেপ্রোমেটাস লেপ্রসি ।
৮. এমডিটি (মাল্টিড্রাগ থেরাপি)—ভারতের সব সরকারি হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রে বিনামূল্যে পাওয়া যায়।
৯. হাতে থাবার মতো বিকৃতি (ক্লু হ্যান্ড), পায়ের পাতা তুলতে না পারা (ফুট ড্রপ)।
১০. সাধারণ ভাবে রোগীকে পরীক্ষা করেই রোগ বোঝা যায়— নিশ্চিত হওয়ার জন্য ত্বকে জীবাণুর উপস্থিতি অনুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখা হয়।

With Best compliments from

Alteus Biogenics Pvt. Ltd.

Regd. Office : 18/61B Dover Lane, Kolkata - 700 029

Phone : 033 2486-7885 / 8087

Head Office : 14-B, Dover Lane, 1st Floor, Kolkata - 700 029